HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মনোবিজ্ঞানে গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

টপিক – ০১ মানসিক চাপ ও এর প্রকৃতি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

টপিক ০২: মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

টপিক ০৩: চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

টপিক ০৪: পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

টপিক ০৫: পরীক্ষণের ধাপসমূহ

টপিক ০৬: পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

This Topic is important for

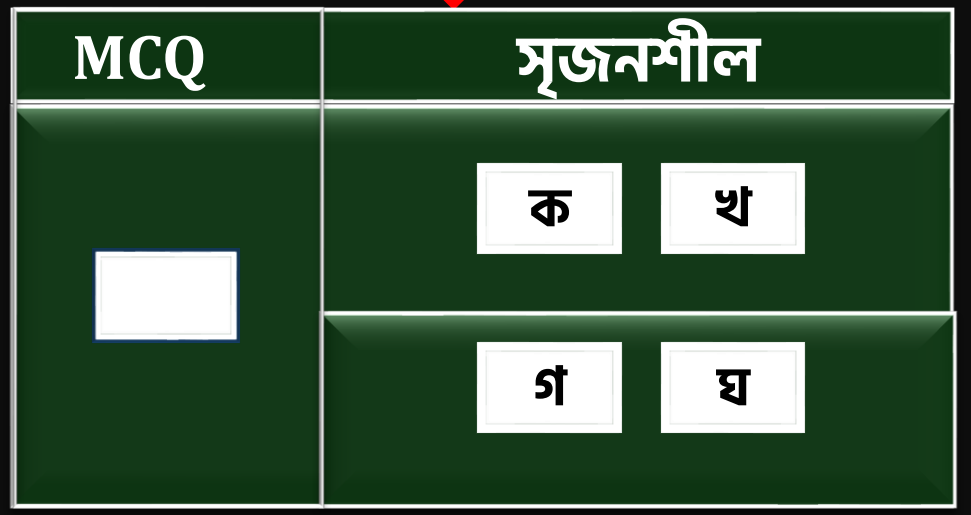

গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন, "জানার মাঝে অজানাকে করেছি সন্ধান" তেমনি গবেষকও উপস্থিত জ্ঞানের মধ্যকার অজানা অংশটুকু খুঁজে দেখার চেষ্টা চালিয়ে যান। যে সকল ঘটনার উদ্ভব ও ফলশ্রুতি মানব স্বার্থের ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক দিককে প্রভাবিত করতে চায়, সে সকল ঘটনা সম্পর্কে মানুষ জানার আগ্রহ অনুভব করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা ব্যাতীত গবেষণার অর্থ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য। গবেষণা হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে কোনো গবেষণা সমস্যার বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবসম্মত সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত অনুসন্ধান। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানকে গবেষণা বলে। গবেষণা একটি সমস্যা নিয়ে শুরু হয়, তথ্য সংগ্রহ করে, সংগৃহীত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে এবং প্রকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে। অর্থাৎ কোনো সমস্যার পর্যাপ্ত সমাধান লাভের লক্ষ্যে ব্যবহৃত পদ্ধতিগত ও পরিশীলিত কৌশলকে গবেষণা বলা যায়। গবেষণা হলো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তথ্যানুসন্ধানের একটি কলা বা আর্ট। গবেষণা সবসময়ই কোনো না কোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিবেদিত।

গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

যখন আমরা একজন বিজ্ঞানীর কথা চিন্তা করি তখন গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি বেষ্টিত সাদা ল্যাব কোট পরিহিত একজন ব্যক্তির চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠে। কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চা যে কোনো জায়গায় হতে পারে এবং একমাত্র যে উপকরণটি দরকার তা হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific method)। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকারী উপাদান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে বিজ্ঞানের ভিত্তি।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো একটি অপরিহার্য উপকরণ, যে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা শুরু হয় সাধারণ কৌতূহল থেকে-জানার তাগিদ থেকে। এ কৌতূহল তখনই ফলদায়ক হয় যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে অনুসন্ধানের সে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার দ্বারা ধারাবাহিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব।

বিজ্ঞানী যে যৌক্তিক পদ্ধতিতে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলি বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, সাধারণ ভাষায়, তাকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে থাকে।

গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

বি. এফ. এন্ডারসন বলেন, "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যাদানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নিয়মাবলি হিসেবে সংজ্ঞায়িত ক্রা যায়: কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান, সাধারণীকরণ, নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ, পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ, নিশ্চিতকরণ এবং সামঞ্জস্যবিধান।"

(The scientific method is here defined as the following set of rules for describing and explaining phenomena: operational definition, generality, controlled observation, repeated observation, confirmation and consistency. উৎস: The Psychology Experiment; 1966; P. 4)

ক্রাইডার, গোথালস, কেভানহ্ এবং সলোমন বলেন, "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো একটি সমস্যা শনাক্তকরণ, উপাত্ত সংগ্রহকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এর সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাইকরণের একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।"

("The scientific method is a system of procedures for identifying a problem, gathering data, drawing conclusions and testing the accuracy of these conclusions." উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 8.)

মনোবিজ্ঞানের যে পদ্ধতিসমূহ আমরা আলোচনা করব যদিও তাদের একটা নিজস্ব প্রক্রিয়া রয়েছে, তবু নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সকল পদ্ধতির জন্য সাধারণ (Common)।

গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

সমস্যা শনাক্তকরণ (Identification of the Problem): যদিও সাধারণ কৌতূহল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অনুপ্রেরণা যোগায়, তবু গবেষক এ কৌতূহলের ঊর্ধ্বে উঠে যে সমস্যা নিয়ে তিনি অনুধ্যান করতে চান তা শনাক্ত করেন। এর জন্য গবেষককে তিনটি কাজ করতে হয়। প্রথমত, যে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি জানতে চান সে বিষয়ে সতর্কতার সাথে চিন্তা করতে হবে এবং সমস্যাটির একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন গবেষক মানুষের স্মৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী এবং তিনি একটি শব্দ তালিকা কোন ব্যক্তি কতক্ষণ স্মরণে রাখতে পারেন সে বিষয়ে নজর দিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে গবেষক উপযুক্ত চল শনাক্ত করেন। চল হলো যে কোনো পরিবর্তনশীল শর্ত যা একজন পারীক্ষের বিশেষ কর্মসম্পাদন থেকে শুরু করে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং পারীক্ষের মানসিক প্রস্তুতি পর্যন্ত বিস্তৃত। বহু সংখ্যক চল মানব আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তাই মনোবিজ্ঞানে একটি সমস্যার চল শনাক্তকরণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

তৃতীয়ত, গবেষককে অবশ্যই এ সকল চলের প্রায়োগিক সংজ্ঞা (Operational definition) দিতে হবে। প্রায়োগিক সংজ্ঞা হলো পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনা বা আচরণের বর্ণনা যা পরিমাপ করা যায়। যেমন একজন মনোবিজ্ঞানী ক্ষুধা অনুধ্যান করতে চান। তাহলে তাকে ক্ষুধা বলতে কত ঘণ্টা খাবার থেকে বঞ্চিত রাখা হবে তা সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

উপাত্ত সংগ্রহ (Data Collection) : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উপাত্ত সংগ্রহ করা। সাধারণ ধারণা এমনকি যুক্তির উপর নির্ভর না করে ঘটনা যেভাবে ঘটছে তার উপর ভিত্তি করে গবেষক অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ রেকর্ড ও পরিমাপ করবেন। কোর্টভবনের বিচারকের মতো একজন গবেষক সংগৃহীত তথ্যের মূল্যায়ন করে তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বস্তুনিষ্ঠতার প্রয়োজনে মনোবিজ্ঞানীদের প্রায়শ নৈর্ব্যক্তিক এবং রীতিসিদ্ধ ভাষা ব্যবহার করতে হয়। যেমন- পুরুষ, মহিলা, শিশু এবং প্রাণী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার না করে মনোবিজ্ঞানিগণ “পারীক্ষ” বা "পরীক্ষণপাত্র” (Subjects) এবং “জীব” (Organisms) প্রায়শই ব্যবহার করেন। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অনভিপ্রেত শব্দগুলো পরিহার করে রীতিসিদ্ধ ভাষা ব্যবহার করলে তা গবেষককে সংক্ষিপ্ত এবং সঠিক ফলাফল প্রদানে সহায়তা করে।

গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

ফলাফলের প্রতিবেদন (Report Findings): বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তৃতীয় এবং চূড়ান্ত বিষয় শুরু হয় উপাত্তের বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এটি করার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা গণিত থেকে ধার করা কৌশল পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ (Statistical analysis) ব্যবহার করেন। উপাত্তের বর্ণনা করতে, উপাত্ত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, ফলাফল যে ঘটনাক্রমে হয়নি তার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করা যেতে পারে। একই সাথে, পরিসংখ্যান পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানীদের তাদের উপাত্ত সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা দেয়।

পরিশেষে, মনোবিজ্ঞানিগণ তাঁদের ফলাফল মনোবৈজ্ঞানিক জার্নালে অথবা পুস্তকে প্রকাশ করেন। গবেষণা প্রতিবেদন দু'ধরনের মূল্যবান কাজ সম্পাদন করে। প্রথমত, এটি গবেষককে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে তার কাজ উপস্থাপন করতে অনুমোদন করে, যেখানে জুরি বোর্ড দ্বারা তা বিচার করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মনোবিজ্ঞানে গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

টপিক – ০২ মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

টপিক ০২: মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ব্যাপক ও বহুমুখী। মস্তিষ্ক এবং শিক্ষণ থেকে শুরু করে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক ও মানসিক বৈকল্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অনুধ্যানের জন্য মনোবিজ্ঞানিগণ বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এ অধ্যায়ে আমরা মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করব। এ সকল পদ্ধতি হলো :

১. পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method)
২. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observational Method)
৩. চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clinical Method)
৪. পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical Method)
৫. জরিপ পদ্ধতি (Survey Method)
৬. সহসম্পর্ক অনুধ্যান পদ্ধতি (Correlation Studies Method)
৭. ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি (Case Study Method)

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ উপাত্ত সংগ্রহের জন্য এবং আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা, ভবিষ্যদ্বাণী করা ও পরিবর্ধনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্তদর্শন পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয় এবং বর্তমানকালে আর ব্যবহার করা হয় না। পরীক্ষণ পদ্ধতিই কেবল কারণ-এবং-ফলাফল (cause-and-effect) সম্পর্ক শনাক্ত করতে পারে, যা মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য অর্জনে খুবই প্রয়োজন। এজন্য প্রায় সকল মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে, পরীক্ষণ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। যা হোক, আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণে মনোবৈজ্ঞানিক অনুধ্যানের সকল পদ্ধতিরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক চরিত্র অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে পরীক্ষণ পদ্ধতিকে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মনে করা হয় এবং মনোবিজ্ঞানিগণ অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতিকে সরচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যে সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন- কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান, বস্তুনিষ্ঠতা, নিয়ন্ত্রণ, পুনরাবৃত্তি, যথার্থতা প্রমাণ প্রভৃতি সবই পরীক্ষণ পদ্ধতিতে বর্তমান রয়েছে। পরীক্ষণ পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত নিরীক্ষণ পদ্ধতিও বলা হয়।

ক্রাইডার, গোথালস, কেভানহ্ এবং সলোমন-এর মতে, "একটি পরীক্ষণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একজন বিজ্ঞানী একটি নির্দিষ্ট পথে অধ্যয়নের একটি বস্তুকে ব্যবহার করেন এবং তারপর আচরণের ফলাফল প্রত্যক্ষ করেন।"

(An experiment is a process in which a scientist treat an object of study in a specific way and then observes the effects of the treatment, উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 12)

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

Barry F. Anderson বলেন, "পরীক্ষণ হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে কেউ দুটি চলের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য একটির মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন এনে দেখেন এর ফলে অন্যটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় কিনা।"

(An experiment is a situation in which one observes the relationship between two variables by deliberately producing a change in one and looking to see whether this alteration produces a change in the other. উৎস: The Psychology Experiment, 1966.)

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

Wayne Weiten-এর মতে, "পরীক্ষণ হলো এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যেখানে অনুসন্ধানকারী সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে একটি চল প্রয়োগ করেন এবং তার ফলে দ্বিতীয় চলে কোনো পরিবর্তন আসে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করেন।"

(The experiment is a research method in which the investigator manipulates a variable under carefully controlled conditions and observes whether there are changes in a second variable as a result. উৎস: Psychology; Brooks / Cole Publishing Company; 1989; P. 38.)

William Buskist এবং David W. Gerbing বলেন, "পরীক্ষণ হলো একটি গবেষণা পদ্ধতি যেখানে অনুসন্ধানকারী কতগুলো নির্দিষ্ট চল প্রয়োগ করেন এবং অন্যান্য চলের উপর তাদের প্রভাব পরিমাপ করেন।"

(An Experiment is a research method in which the investigator manipulates certain variables and measures their effects on other variables. উৎস: Psychology: Scott, Foresman/ Little, Brown Higher Education, 1990; P.34.)

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে সুব্যবস্থিত ও সুপরিকল্পিত অবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উদ্দীপকের প্রতি পরীক্ষণপাত্রের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। যে অনুসন্ধান কার্যে উদ্দীপকের প্রভাবের উপর অনুসন্ধানকারীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে তাকে পরীক্ষণ বলা যায়। পরীক্ষণকার্য সাধারণত গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের ভেতর পরিচালনা করা হয়ে থাকে। তবে অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে গবেষণাগারের বাইরেও পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করা যেতে পারে। উত্তয়ার্থ এবং শ্লোজবার্গ (১৯৫৪) পরীক্ষণ পদ্ধতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন:

(১) পরীক্ষণকারী পর্যবেক্ষণীয় ঘটনাটি যখন খুশি তখনই সৃষ্টি করতে পারেন; সুতরাং প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকেন।

(২) তিনি একই রকম অবস্থা যতবার খুশি পুনরুৎপাদন করে ফলাফল যাচাই করতে পারেন।

(৩) তিনি কতগুলো অবস্থার পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি করে ফলাফলের পরিবর্তন লক্ষ করতে পারেন।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ। মনোবিজ্ঞানী বিশেষ কোনো আচরণকে গবেষণাগারে সৃষ্টি করেন এবং যে সব অবস্থা বা শর্তের ওপর আচরণটি নির্ভর করে সে সব শর্তকে তিনি পরীক্ষণের প্রয়োজনানুসারে তার ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করেন। নিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো কোনো শর্ত বা অবস্থাকে পরীক্ষণের প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো, কমানো, উপস্থিত করা বা অনুপস্থিত রাখা। ইচ্ছামত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষণ পদ্ধতির অনন্য বৈশিষ্ট্য।.

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে আচরণের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চার প্রকারের শর্ত বা চল দেখা যায়। চল বা ভেদ্য (variable) বলতে আমরা বুঝি এমন কোনো শর্ত বা অবস্থা অথবা এমন কোনো উদ্দীপক বা প্রতিক্রিয়া যা পরিবর্তনশীল বা যা পরিবর্তন করা যায়। চল চারটি হচ্ছে-

১. অনির্ভরশীল চল (Independent variable): যে চল অন্য কোনো চলের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই স্বাধীনভাবে অন্য উদ্দীপক বা আচরণের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বা পরিবর্তন আনতে সক্ষম তাকে অনির্ভরশীল চল বলে। পরীক্ষণকারী পরীক্ষণের প্রয়োজনে তার ইচ্ছানুযায়ী অনির্ভরশীল চলের হ্রাস বা বৃদ্ধি করে থাকেন।

পরীক্ষণে এ চল কখনো অনুপস্থিত থাকে না। যদি থাকে তবে সে ক্ষেত্রে পরীক্ষণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ পরীক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ওপর অনির্ভরশীল চলের প্রভাব পরীক্ষা করা। ফলে অনির্ভরশীল চল অনুপস্থিত থাকলে পরীক্ষণই হবে না। তাই পরীক্ষণের জন্য অনির্ভরশীল চলের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক।

২. নির্ভরশীল চল (Dependent variable) : যে চলকে তার উপস্থিতি বা সৃষ্টির জন্য অনির্ভরশীল চলের ওপর নির্ভর করতে হয়, তাকে নির্ভরশীল চল বলে। এ চল অনির্ভবশীল চলের দ্বারা সৃষ্ট, প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হয়। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণে উদ্দীপকের প্রতি জীবের প্রতিক্রিয়া বা সাড়াই হলো নির্ভরশীল চল।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

৩. মধ্যবর্তী চল (Intervening variable): অনির্ভরশীল ও নির্ভরশীল চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী চলকে মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী চল বলে। পরীক্ষণপাত্রের বয়স, অভ্যাস, লিঙ্গ, অভিজ্ঞতা, প্রেষণা প্রভৃতি মধ্যবর্তী চলের উদাহরণ।

৪. বাহ্যিক চল (Extraneous variable): বাহ্যিক পরিবেশ থেকে যে চলের উদ্ভব হয় তাকে বাহ্যিক চল বলা যেতে পারে। যেমন গবেষণাগারের তাপমাত্রা, মিছিলের শব্দ, বাইরের হট্টগোল বা হৈ চৈ প্রভৃতি।

উপরোক্ত চলগুলোকে বোঝার জন্য একটি সাধারণ উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক, আমরা গবেষণা করে দেখতে চাই কোন রঙের আলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া কাল সবচেয়ে বেশি। এখানে বিভিন্ন রঙের আলো হলো অনির্ভরশীল চল, আলোক রশ্মির প্রতি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকাল হলো নির্ভরশীল চল এবং ব্যক্তির বয়স, সে ছেলে না মেয়ে, তার অভিজ্ঞতা, প্রেষণা ইত্যাদি হলো মধ্যবর্তী চল। আর কক্ষের গরম আবহাওয়া বা পাশের কোলাহল অথবা কোনো বিকট শব্দ প্রভৃতি হলো বাহ্যিক চল। অনেকে তিন ধরনের চলের উল্লেখ করেছেন, যেমন- অনির্ভরশীল, নির্ভরশীল ও বাহ্যিক চল। এদের মতে অনির্ভরশীল ও নির্ভরশীল চল ছাড়া সবই হলো বাহ্যিক চল।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

একটি পরীক্ষণে অনির্ভরশীল চলের প্রভাব নির্ণয় করার জন্য পরীক্ষণকারী (Experimenter) পারীক্ষদের (Subjects) দুটি দলে ভাগ করেন। একটি দল হলো পরীক্ষণ দল, অন্যটি নিয়ন্ত্রিত দল। পরীক্ষণ দল হলো সেই দল যেখানে পারীক্ষকে অনির্ভরশীল চলের নিরীখে বিশেষ ব্যবস্থা (Special treatment) প্রদান করা হয়। অপরদিকে, নিয়ন্ত্রিত দল একই ধরনের পারীক্ষ নিয়ে গঠিত হয়, কিন্তু এরা পরীক্ষণ দলের মতো বিশেষ ব্যবস্থা পায় না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা শিক্ষণের উপর আবৃত্তির প্রভাব দেখতে চাই। একদল পারীক্ষকে আবৃত্তির মাধ্যমে একটি কবিতা মুখস্থ করতে এবং অন্যদলকে কবিতাটি শুধু মুখস্থ করতে বলা হলো। এক্ষেত্রে প্রথম দল হলো পরীক্ষণ দল এবং দ্বিতীয় দল হলো নিয়ন্ত্রিত দল।

পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দল প্রায় একই রকম, পার্থক্য শুধু অনির্ভরশীল চলের নিরীখে একদল বিশেষ ব্যবস্থা পায়, অন্যদল তা পায় না। এই শর্তটিই হলো পরীক্ষণ পদ্ধতির অন্তর্নিহিত মূল যুক্তি যা পরীক্ষণ পদ্ধতিকে অনন্যতা দান করেছে।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Experimental Method)

পরীক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১। একাধিক চলের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে।

২। পরীক্ষাধীন চলের উপর অন্যান্য চল বা উপাদান যাতে অপ্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করতে না পারে এজন্য সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। পরীক্ষণকারী তার ইচ্ছামতো চল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

৪। এ পদ্ধতিতে গবেষণাগারের অবস্থা বজায় রেখে প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুসন্ধানকার্য সম্পাদন করা যায়।

৫। ঘটনার পুনরাবৃত্তি পরীক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি

৬। এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য পরীক্ষণকারীকে সরাসরি উপস্থিত থাকতে হয়।

৭। অনেক সময় নমুনায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়-একটি পরীক্ষণ দল অন্যটি নিয়ন্ত্রিত দল।

৮। পরীক্ষণ পদ্ধতি উপাত্তগুলো পরিসংখ্যানের ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

৯। বিজ্ঞানিগণ বার বার একই পরীক্ষণ সম্পাদন করে ফলাফলের সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

১০। এখানে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের স্থান নেই। এ পদ্ধতিতে বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। বহু পূর্ব থেকেই মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অর্থাৎ পরীক্ষণ পদ্ধতির পূর্বে যে পদ্ধতি বহুলাংশে প্রচলিত ছিল তা হলো নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। এমন কতগুলো আচরণ বা ঘটনা আছে যা গবেষণাগারে তৈরি করা যায় না; সে সব আচরণ বা ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি হলো এমন একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যেখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো বিষয় বা ঘটনার সামনে উপস্থিত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণকে অনেকেই শুধু পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ

ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগীরা বলেছেন, "নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণে দুটো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে: (১) পরীক্ষণপাত্রকে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করা এবং (২) পরীক্ষণপাত্রের নিজস্ব আচরণের সাথে পর্যবেক্ষণকারী কোনভাবেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।" (Naturalistic observation has two general characteristics : (1) Subjects are observe in their natural environments, and (2) The observer does not attempt to interfere with the natural behavior of the subject. উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 9.)

পি.ভি. ইয়াং (P.V. Young)-এর মতে, "দৃশ্যমান বিষয়কে সুশৃঙ্খলভাবে দেখাকেই পর্যবেক্ষণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।"

(Observation may be defined as systematic viewing, coupled with consideration of the seen phenomena. উৎস: Scientific Social Surveys and Research; Printice-Hall Inc.; N.J.; 1956; P. 22)

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ

The concise Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে যে, নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ হলো "পারস্পরিক সম্পর্ক বা কার্যকরণ, সম্পর্কের ভিত্তিতে সংঘটিত বিষয়াবলি সঠিকভাবে লক্ষ্য করা এবং রেকর্ড করা।".

(Accurate watching, noting of phenomena as they occur in nature with regard to cause and effect and mutual relationship. উৎস: Moser and Kalton: Survey Methods in Social Investigation; Heinemann
Education Books; London; 1971; P. 245.)

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি দু'ধরনের হতে পারে। যথা-

(১) প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ

(২) পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ

(১) প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ: প্রাকৃতিক (স্বাভাবিক) পরিবেশে সংঘটিত কোনো ঘটনাকে অনুরূপভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলতে মূলত প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণের দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

(১) পর্যবেক্ষণকারী স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রেখে পরীক্ষণপাত্রের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন।

(২) পরীক্ষণ পাত্রের স্বাভাবিক আচরণ যাতে বিঘ্নিত না হয়, পর্যবেক্ষণকারী সেদিকে খেয়াল রাখেন।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ

প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ তখনই সর্বোত্তম পর্যবেক্ষণ হবে, যখন পরীক্ষণপাত্র বুঝতে না পারে যে তাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক পরিবেশে যা ঘটে তার উপর খুব কম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। পর্যবেক্ষণকালে যা কিছু ঘটছে, আমরা কেবলমাত্র সে সব আচরণই অনুধ্যান করতে পারি। তাছাড়া, স্বাভাবিক, পরিবেশে নির্দিষ্ট চলসমূহের মধ্যকার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করাও খুব কঠিন।

এ পদ্ধতিকে বিষয়গত পদ্ধতি বলা হয়। একে আবার পরোক্ষ পদ্ধতিও বলা হয়। কারণ এ পদ্ধতিতে অপরের বাহ্যিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়া সম্পর্কে অনুমান করা হয়।

প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে পরীক্ষণকারী স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রেখে প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। যে সকল ঘটনাকে পরীক্ষণাগারে তৈরি বা পুনরুৎপাদন করা যায় না, যেমন- বিবাহ বিচ্ছেদ, সামাজিক সংঘর্ষ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ইত্যাদি ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য মনোবিজ্ঞানী প্রকৃত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন।

এ পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষককে ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এ পদ্ধতি ব্যক্তি দোষে দুষ্ট। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করা কঠিন ব্যাপার।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ

(২) পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ: যখন কোনো পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিবেশে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাকে পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ বলে। এ ক্ষেত্রে ঘটনার কোন্ কোন্ উপাদান পর্যবেক্ষণ করতে হবে, কখন এবং কীভাবে করতে হবে, কী কী উপকরণ উপস্থাপন করতে হবে তা আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ৫ বছর বয়সী শিশুদের খেলার প্রতি আগ্রহ আমরা পর্যবেক্ষণ করতে চাই। এ ক্ষেত্রে একটি বড় হল ঘরে নির্দিষ্ট ব্যবধানে যথাক্রমে ফুটবল, টেনিস বল, ক্রিকেট সামগ্রী, খেলনা চেয়ার টেবিল, খেলনা মটর গাড়ি, মাটির পুতুল, ছবির বই, খেলনা হাড়ি পাতিল ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হলো। এরপর ৫ বছর বয়সী একদল শিশুকে উক্ত হল ঘরে ছেড়ে দিয়ে একজন পর্যবেক্ষণকারী এমন এক জায়গায় অবস্থান করবেন যেখান থেকে তিনি শিশুদের কার্যকলাপ লক্ষ করতে পারবেন, কিন্তু শিশুরা তাকে দেখতে পাবে না। এ ধরনের পর্যবেক্ষণই হলো পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা

(১) প্রায় সব ধরনের আচরণই এ পদ্ধতির আয়ত্তাধীন।

(২) নির্ধারিত ঘটনা বা আচরণকে স্বাভাবিক পরিবেশে যখন ঘটনাটি ঘটছে তখন পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(৩) এ পদ্ধতির জন্য বিশেষ গাণিতিক দক্ষতা বা জটিল নকশা প্রণয়নের প্রয়োজন নেই।

(৪) শিশু আচরণ বা প্রাণীদের আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অধিক সুবিধাজনক!

(৫) পরীক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বাস্তবে কতটুকু কার্যকর, তা পরীক্ষা করার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(৬) পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তি প্রায় অসম্ভব। কারণ, প্রাকৃতিক পরিবেশে সংঘটিত ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়।

(৭) পর্যবেক্ষণকারী দক্ষ না হলেও পর্যবেক্ষণে তেমন অসুবিধা হয় না।

(৮) এ পদ্ধতিতে চলের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জটিলতা নেই।

(৯) প্রায় সকল পদ্ধতির সহায়ক হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে।

(১০) এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যরাশিকে পরিসংখ্যানের ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল অনেকটা ব্যক্তিনিষ্ঠ হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত সংস্কার, পূর্বধারণা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের ফলাফলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(২) ইচ্ছা করলেই যখন তখন ঘটনার সৃষ্টি বা পর্যবেক্ষণ করা যায় না। পর্যবেক্ষককে কোনো ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

(৩) এ পদ্ধতির একটা বড় দোষ হলো, প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা যাচাই করা খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ পর্যবেক্ষণ সহজে পুনরাবৃত্তি করা যায় না।

(৪) প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা কঠিন।

(৫) এ পদ্ধতিতে চলসমূহের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই।

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারে বেশ কিছু অসুবিধা থাকলেও সামাজিক গবেষণায় এ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশে তথ্যানুসন্ধান সম্ভব হয় না, যেখানে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখা দরকার, নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিই তখন একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। তাইতো নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। অভিজ্ঞ ও দক্ষ পর্যবেক্ষকের সুপরিকল্পিত পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আহরণ সম্ভব হয়।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

চিকিৎসামূলক পদ্ধতি

আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। কতগুলো সমস্যা আমরা সহজেই সমাধান করতে পারি। আবার কতগুলো সমস্যা আছে যা দিন দিন বাড়তে থাকে এবং আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। এ পর্যায়ে ব্যক্তি বাস্তবের সাথে সংগতি স্থাপনে ব্যর্থ হয় এবং তার মধ্যে মানসিক রোগের উপসর্গ বিকাশ পেতে থাকে। মানসিক রোগের কারণ উদ্‌ঘাটন ও তার প্রকৃতি নির্ণয় করার জন্য মনোবিজ্ঞানিগণ চিকিৎসামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।

লোকজন যখন তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের কাছে যায়, তখন সাধারণত চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ক্লিফোর্ড টি. মর্গান এবং সাথীরা বলেছেন, "আমরা এখানে চিকিৎসামূলক পদ্ধতিকে বিজ্ঞানে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। একটি পদ্ধতি হিসেবে এটি চিকিৎসামূলক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলো একত্রীভূত করে।"

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

চিকিৎসামূলক পদ্ধতি

(Here we are concerned with the clinical method as a tool in science. As a method, it combines features of clinical observation, experiment, and systematic observation. উৎস: Introduction to Psychology; Tata McGrow-Hill Publishing Company Ltd.; New Delhi; 1993; P. 17.)

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসামূলক পদ্ধতির সাহায্যে প্রধানত মানুষের উপযোজনমূলক আচরণের সমস্যাবলির উপর অধ্যয়ন করা হয়। এ পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তির মানসিক ব্যাধির স্বরূপ ও কারণ জানা যায় এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। এ পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

চিকিৎসামূলক পদ্ধতি

চিকিৎসামূলক পদ্ধতিতে মনোচিকিৎসক মানসিক রোগীর অতীত ইতিহাস, পারিবারিক সম্পর্কের ইতিহাস, চাকরির ক্ষেত্রে তার আচার-ব্যবহার, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করে রোগের উৎস সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। এভাবে তথ্য সংগ্রহ করে মনোবিজ্ঞানী তার উপযোজনমূলক আচরণের সমস্যা সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

চিকিৎসামূলক পদ্ধতিতে ঘটনা অনুধ্যান (case study) দৃষ্টান্ত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর মনোস্মীক্ষণ তত্ত্ব মূলত বিভিন্ন মানসিক রোগীর উপর পরিচালিত ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

চিকিৎসামূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে হয়। কোনো শারীরিক রোগ আছে এরূপ সন্দেহ হলে মনোবিজ্ঞানী ডাক্তারের সহযোগিতা নিতে পারেন। বিভিন্ন অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির কোনো ধরনের সমস্যা আছে তা শনাক্ত করে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

আচরণ বৈকল্যের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পেশাগত, পারিবারিক তথ্য প্রভৃতি সংগ্রহের কৌশল হিসেবে চিকিৎসামূলক পদ্ধতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

চিকিৎসামূলক পদ্ধতি

চিকিৎসামূলক পদ্ধতির সুবিধা

(১) এ পদ্ধতির সাহায্যে মানসিক রোগের কারণ এবং এর গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা যায়।

(২) সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে এবং তার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(৩) চিকিৎসক নিজে দীর্ঘদিন যাবৎ রোগীর আচরণ অনুধ্যান করে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

(৪), দীর্ঘদিন যাবৎ রোগীর আচরণ অনুধ্যান করেন বলে চিকিৎসক যথার্থ বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

চিকিৎসামূলক পদ্ধতি

চিকিৎসামূলক পদ্ধতির অসুবিধা

(১) এটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

(২) তথ্য সংগ্রহের কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই।

(৩) কোনো পরীক্ষণমূলক প্রকল্প গঠন করা যায় না।

(৪) রোগী প্রদত্ত তথ্য যথার্থভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না।

(৫) ঘটনা অনুধ্যানের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়।

বর্তমানকালে চিকিৎসামূলক পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মানসিক রোগের কারণ উদ্‌ঘাটন ও তার প্রকৃতি নির্ণয়, মানসিক রোগ শনাক্ত করা ও রোগীর ইতিহাস পর্যালোচনা প্রভৃতির জন্য চিকিৎসামূলক পদ্ধতি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরিসংখ্যান পদ্ধতি

আধুনিককালে মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তবে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যবহার অন্যান্য পদ্ধতি হতে অনেকটা পৃথক। পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে অন্যান্য পদ্ধতির মতো তথ্য সংগ্রহ করা হয় না বরং অন্যান্য পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করাই হলো এ পদ্ধতির কাজ।

পরিসংখ্যান পদ্ধতির মূল কাজ হলো তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা এবং তথ্যের বিশ্লেষণ করা। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য গড়, মধ্যমা, প্রচুরক, আদর্শ বিচ্যুতি, গড় বিচ্যুতি, শতমিক বিন্দু, শতমিক ক্রম প্রভৃতি পরিসংখ্যানিক পরিমাপ ব্যবহার করা হয়।

দুটো ঘটনা বা চলের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য সহসম্পর্ক (Correlation) এবং একটা চলের পরিবর্তনের ফলে অন্যটিতে কী ধরনের বা কতটুকু পরিবর্তন ঘটল তা জানার জন্য নির্ভরণ (Regression) ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া প্রকল্প যাচাই করার জন্য। পরীক্ষা, ২ পরীক্ষা, F পরীক্ষা প্রভৃতি পরীক্ষা (test) ব্যবহার করা হয়।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরিসংখ্যান পদ্ধতি

মনোবিজ্ঞানের গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যথা-

(১) নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার লক্ষ্যে পরীক্ষণের পরিকল্পনা বা নকশা নির্ধারণে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

(২) এ পদ্ধতির অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে উপাত্তের বিশ্লেষণ ও সরলীকরণ।

(৩) কতগুলো নমুনার ওপর ভিত্তি করে সমগ্র জনসমষ্টি সম্পর্কে একটা অনুমান বা ধারণা পাওয়া যায়। এ সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুমান (statistical inference) কতটুকু নিশ্চিত, পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে তা নির্ণয় করা সম্ভব।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরিসংখ্যান পদ্ধতি

পরিসংখ্যান পদ্ধতির সুবিধা

(১) পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

(২) এ পদ্ধতির সাহায্যে একটি প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা বাছাই করা যায়।

(৩) এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

(৪) ইহা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন নকশা প্রণয়নে সাহায্য করে।

(৫) নমুনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমগ্রক সম্পর্কিত অনুমান সঠিক কিনা তা যাচাই করা যায়।

(৬) বিপুল পরিমাণ তথ্যকে সংক্ষেপে এবং অর্থপূর্ণভাবে এ পদ্ধতির সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পরিসংখ্যান পদ্ধতি

পরিসংখ্যান পদ্ধতির অসুবিধা

(১) পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে তথ্য সম্পর্কিত সামগ্রিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায় না।

(২) প্রাপ্ত তথ্য সুষম না হলে এ পদ্ধতি অনুপযোগী।

(৩) এ পদ্ধতির সাহায্যে গুণবাচক তথ্য ব্যাখ্যা সহজ নয়।

মনোবিজ্ঞানের তথ্যসমূহকে সংখ্যার মাধ্যমে অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ভূমিকাই মুখ্য। পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে উপাত্তের গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে উপাত্তসমূহকে সংখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ করে তোলা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন আচরণজনিত ঘটনার অনুবন্ধমূলক তথ্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে পরিসংখ্যান পদ্ধতি কাজ করে। বর্তমান কালে প্রায় সকল প্রকার গবেষণা কার্যের ফলাফল সহজ, সংক্ষিপ্ত, নির্ভুল আকারে প্রকাশের জন্য পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতি

সামাজিক আচরণ' অনুধ্যানের জন্য জরিপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। জরিপ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায় জনমত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে। এ পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়।

জরিপ পদ্ধতিতে সাধারণত লিখিত প্রশ্ন বা মৌখিক প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। লিখিত প্রশ্নপত্র এমনভাবে তৈরি করতে হবে তা যেন প্রাসঙ্গিক হয়। অর্থাৎ যে প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তা যেন গবেষণার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে যথাযথ হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় লক্ষ রাখতে হবে প্রশ্নগুলো যাতে সহজবোধ্য, সুস্পষ্ট, যথাযথ হয় এবং একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। যথাযথ এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন জরিপ পদ্ধতির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতিতে যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় তা দু'ধরনের হতে পারে। যথা-

(ক) মুক্ত প্রান্ত (Open ended): এ ধরনের প্রশ্নে উত্তরদাতা যে কোনো উত্তর দিতে পারেন। উত্তরদাতা এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে তার মত প্রকাশ করতে পারেন।

(খ) কাঠামোবদ্ধ (Structured): এ ধরনের প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের সম্ভাব্য বেশ কটি উত্তর দেয়া থাকে। উত্তরদাতাকে যে কোনো একটি উত্তর বেছে নিতে হয়।

জরিপকারী তার জরিপের উদ্দেশ্য ও সুবিধা অনুযায়ী প্রশ্নমালায় মুক্তপ্রান্ত বা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়ন করে থাকেন।

জরিপ পদ্ধতির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নমুনা চয়ন। সমস্ত জনসংখ্যার সবার উপর জরিপ চালানো সম্ভব নয়। তাই সমগ্রক থেকে প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা সংগ্রহ করে তাদের নিকট থেকে প্রশ্নপত্রের উত্তর সংগ্রহ করা হয়। জরিপ পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করছে নমুনা কতটা প্রতিনিধিত্বমূলক হবে তার উপর। তাই নমুনা যাতে প্রতিনিধিত্বমূলক হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

জরিপ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। নির্বাচনের সময় জনমত যাচাই করার জন্য জরিপ পদ্ধতি সফলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চলের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলেও সমাজ মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় এ পদ্ধতির প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতির সুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে এলাকার জনসংখ্যার প্রত্যেকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় না। শুধুমাত্র দৈবচয়িতভাবে বাছাইকৃত দলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(২) বাছাইকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে সময় কম লাগে এবং শ্রম কম ব্যয় হয়।

(৩) এ পদ্ধতিতে খরচও তুলনামূলকভাবে কম লাগে।

(৪) এ পদ্ধতিতে তেমন কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না।

(৫) এটি জনমত যাচাইয়ের উত্তম হাতিয়ার।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতির অসুবিধা

(১) জরিপ পদ্ধতিতে যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় তা প্রণয়নের জন্য দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র যথার্থ না হলে গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

(২) জরিপ পদ্ধতির আর একটি প্রধান ত্রুটি হলো, যে নমুনা দল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় সে দল যদি জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বমূলক না হয়, তাহলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া সঠিক হবে না।

(৩) এ পদ্ধতির আর একটি ত্রুটি হলো, উত্তরদাতাগণ সব সময় তাদের সত্যিকার মনোভাব প্রকাশ নাও করতে পারেন।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

সহসম্পর্ক অনুধ্যান

মাঝে মাঝে গবেষকগণ চলসমূহের মধ্যে কী সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তা দেখার জন্য জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি বিবাহপূর্ব যৌনতা সম্পর্কে অনুধ্যান করছেন, তিনি অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে যৌন মনোভাবের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা নির্ণয়ের চেষ্টা করতে পারেন। উচ্চ আয়ের লোকদের যৌন সম্পর্কে মনোভাব কি বেশি উদার? যদি দুটি চল কোনোও ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়, তা দেখার জন্য মনোবিজ্ঞানিগণ একটি পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহার করতে পারেন, এবং তাহলো স্যার ফ্রান্সিস গ্যাল্টন কর্তৃক উদ্ভাবিত সহসম্পর্ক (Correlation)। যদিও এর সাথে সম্পর্কিত অংক একটু জটিল। কিন্তু ধারণাটি খুব সহজ। দুটি চল পরিমাপ করা, যেমন- উচ্চতা ও ওজন এবং তারা সম্পর্কিত কিনা তা দেখা।

আরলিচ্ (Ehrlich, ১৯৭৫) গুরুতর শাস্তির সাথে অপরাধ কমার একটি চমকপ্রদ সহসম্পর্ক অনুধ্যানের উল্লেখ করেছেন। এ অনুধ্যানে প্রথমে প্রতিটি রাজ্যে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির কঠোরতার মাত্রা লক্ষ করা হয় এবং পরে তথ্য যাচাই করা হয় যে, ঐ সকল অপরাধ উক্ত রাজ্যসমূহে কেমন সংঘটিত হচ্ছে। সুন্দর সহসম্পর্ক অনুধ্যান হতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির মাত্রা যত বেশি, অপরাধ সংঘটিত হবার পরিমাণ তত কম। এ অনুধ্যানটির সিদ্ধান্ত ছিল যে, কঠিন শাস্তি, যেমন- মৃত্যুদণ্ড, অপরাধ নিবারণ করতে পারে।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

সহসম্পর্ক অনুধ্যান

সহসম্পর্কিত অনুধ্যান বাস্তব জগতের দুটি চলের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। যাহোক, সহসম্পর্কিত অনুধ্যানের একটি গুরুত্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দুটি চল সম্পর্কযুক্ত-তার অর্থ এই নয় যে একটি অন্যটির কারণ। এটা বোঝায় যে, ঘটনা দুটি একত্রে সংঘটিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও চল ক চল খ-এর কারণ হতে পারে। কিন্তু এমন হতে পারে যে দুটি চলের মধ্যকার কার্যকারণ সম্পর্ক (Causal relationship) বিপরীতমুখী। উদাহরণ হিসেবে কঠিন শাস্তি অপরাধ কমায় এ সিদ্ধান্তটির কথা ধরা যাক। উপাত্ত থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে না। কিন্তু কেন নয়? সহসম্পর্কটির কি যথার্থ ও বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা আছে? অবশ্যই আছে। সমাজ মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা যায় যে, কোনো এলাকাতে একটি অপরাধ যদি বিরল প্রকৃতির (কম সংঘটিত) হয়, তাহলে বিচারক ও জুরিগণ একে অপরাধ হিসেবে দেখবেন। কাজেই তাঁরা বিরল প্রকৃতির অপরাধকারীকে কঠিন শাস্তি দেবেন। সম্ভবত একটি অপরাধের বিরলতাই প্রকৃতপক্ষে কঠিন শাস্তির কারণ। এ ধরনের কঠিন শাস্তি কি ভবিষ্যৎ অপরাধ কমায়? সহসম্পর্কিত উপাত্ত থেকে আমরা তা বলতে পারি না। কেবলমাত্র একটি পরীক্ষণ, যেখানে কৃত্রিম জুরী ও কল্পিত অপরাধ ব্যবহার করা হয়, আমাদের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

সামাজিক সমস্যা উন্মেষ ও বিকাশধারা জানার জন্য সামাজিক, চিকিৎসা ও আচরণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির ব্যবহার ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন করে তার সুষ্ঠু সমাধান - পরিকল্পনায় সম্যক সহায়তা করা। এ কারণে তুলনামূলকভাবে আচরণ, চিকিৎসা ও সমাজ বিষয়ে প্রায়োগিক প্রয়োজনে এর ব্যবহার যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

বিভিন্ন বিজ্ঞানী ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কারো কারো মতে এটি সমাজ গবেষণার একটি পদ্ধতি, আবার কেউ কেউ একে গবেষণার কৌশল, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ইত্যাদি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

The Social Work Dictionary (Barker, 1994: 30) ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, "A method of evaluation by examining systematically many characteristics of one individual, group, or community usually over an extended period."

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

আবার অনেকে মনে করেন, ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি হলো এক ধরনের জীবন বৃত্তান্ত পদ্ধতি। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করার কৌশলকে ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি বলেন। এ পদ্ধতির লক্ষ্য হলো মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে বুঝতে পারা ও তাদের সাহায্য করা। মানসিক রোগীর সমস্যাগুলোর বর্ণনা, বিভিন্ন অসুবিধার ক্ষেত্রে রোগীকে কীভাবে সহায়তা করা যায় ইত্যাদি বিষয়সমূহ সামনে রেখে গবেষকগণ এ পদ্ধতিতে কাজ করেন। তাছাড়া মনোবিজ্ঞানিগণ জানতে চান এসব সমস্যা কীভাবে রোগীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এজন্য মনোবিজ্ঞানিগণ রোগীদের শৈশবকাল, পরিবার, স্কুল জীবন, সখ, ভালোবাসার সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞানিগণ যে সব তথ্য সংগ্রহ করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

১। ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, লিঙ্গ, জন্ম তারিখ, বয়স, জন্মস্থান ইত্যাদি।

২। যে বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার বর্ণনা।

৩। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, নিকট আত্মীয় স্বজন এবং ব্যক্তির প্রতি বাড়ির অন্যদের মনোভাব।

৪। আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

৫। পারিবারিক শিক্ষা মান।

৬। স্বাস্থ্যবিকাশে বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা।

৭। পারিবারিক আদর্শের সাথে ব্যক্তির আদর্শের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব আছে কিনা।

৮। মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ।

৯। ব্যক্তিত্বের ধরন।

১০। বুদ্ধির ক্রমবিকাশ।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

১১। সামাজিক বিকাশ।
১২। আর্থিক সংগতি বিধান।
১৩। পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি।
১৪। যৌনতা।
১৫। বিশেষ পছন্দ বা অপছন্দ ইত্যাদি।

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতিতে একটি এককের ক্ষুদ্র, সর্বাত্মক ও গভীর দিকসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়। সামাজিক কোনো একককে অনুসন্ধান করাই হলো ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি। বিশ্লেষণাধীন এসব একক ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান, সমষ্টি, ঘটনা, এলাকা, অবস্থা ইত্যাদি হতে পারে।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির সুবিধা

১। বিভিন্ন ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা ও অবস্থান সম্পর্কে সুগভীর এবং সুবিস্তৃত ধারণা লাভ করা যায়।

২। নির্দিষ্ট সমস্যার প্রকৃতি, গভীরতা এবং এর উন্মেষ ও বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি খুঁজে পাওয়া যায়।

৩। এ পদ্ধতিতে এককের ব্যক্তিত্ব, আবেগ, মানসিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

৪। এটি নমুনায়নে সহায়তা করে থাকে।

৫। এর মাধ্যমে একক সম্পর্কে নতুন ধারণা, অন্তর্দৃষ্টি ও নির্দেশনা পাওয়া যায়।

৬। এর ফলে পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

৭। এটি তথ্য তৎসংগ্রহের উপযুক্ত কৌশল তৈরিতে সাহায্য করে।

৮। এটি প্রকল্প গঠনে সহায়ক। এর ফলে নতুন গবেষণার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি

ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতির অসুবিধা

১। এ পদ্ধতিতে অপ্রাসঙ্গিক ও অতিমাত্রায় আত্মনিষ্ঠ এবং পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য সংগৃহীত হবার সম্ভাবনা থাকে।

২। সাধারণীকরণ ও তুলনাকরণের কোনো সুযোগ নেই।

৩। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা কম থাকায় গবেষকের ভ্রান্ত ধারণা লক্ষ করা যায়।

৪। এ ঘটনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ গবেষকের অভাব থাকে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সব সময় পাওয়া যায় না।

৫। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ পদ্ধতিতে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় ও সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপ সম্ভব নয়।

৬। প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা কঠিন কাজ। এজন্য এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা কম হয়ে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মনোবিজ্ঞানে গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

টপিক – ০৩ চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

টপিক ০৩: চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

এ পৃথিবীতে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং পারিপার্শ্বিক উপাদানগুলোর পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির আচরণেও পরিবর্তন দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এ সমস্ত পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য, উপাদান এবং আচরণকে চল বলা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, যা কিছু পরিবর্তনশীল বা যাকে পরিবর্তন করা যায়, তাকে চল বা ভেদ্য বলে।

রডিজার, রাস্টন, কেপান্ডি এবং প্যারিস বলেন, "চল শব্দটি দ্বারা কতগুলো বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, যাকে পরিমাপ বা পরিচালনা করা যায়।"

(The term variable refers to some characteristics that can be measured or manipulated. উৎস: Psychology; Little, Brown and Company; 1984; P. 23.)

জন সি. রাচ (John C. Ruch) বলেন, "বিজ্ঞানিগণ পৃথিবীর যে কোনো পরিমাপযোগ্য বিষয়, যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় তাকে চল বলেন।"

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

(Scientists call any measurable dimension of the world that varies over time a variable. উৎস: Psychology; Wodsworth Publishing Company; 1984; P. 32.)

ওয়াইনী ওয়াইটেন বলেন, "গবেষণায় চল হলো কোনো পরিমাপযোগ্য শর্ত, ঘটনা, বৈশিষ্ট্য বা আচরণসমূহ যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় অথবা পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়।"

(Variable in a study are any measurable conditions, events, characteristics or behaviors that are centrolled or observed. উৎস: Psychology; Brooks/Cole Publishing Company; 1989; P. 35)

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

পোস্টম্যান এবং ইগান (Leo Postman and James P. Egan) বলেন, "ব্যাপকার্থে, চল হলো এমন একটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ যার অনেক মূল্যমান থাকতে পারে।"

(In its broadest sense, a variable is a characteristic or attribute that can take on a number of values. উৎস: Experimental Psychology: An Introduction; Harper and Row, New York and John Weatherhill, Inc.,
Tokyo; 1967; P. 1)

প্রকৃতপক্ষে, পরীক্ষণে চল ব্যবহারের তাৎপর্য বেশি। তাই পরীক্ষণে নিরপেক্ষ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে বিশেষ উপাদান, উপকরণ বা আচরণের প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করা হয় তাকে, তার প্রভাবকে এবং যে সব পারিপার্শ্বিক উপাদান ও উপকরণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ও যেগুলো পরীক্ষণপাত্রে ঘটে তাদের সবকিছুকেই সাধারণভাবে চল বলা হয়ে থাকে।

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, চল হলো এমন এক ধরনের বৈশিষ্ট্য, গুণ বা অবস্থা যা একই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

চল চার প্রকার। যথা-

১. অনির্ভরশীল চল,

২. নির্ভরশীল চল,

৩. মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী চল এবং

৪. বাহ্যিক চল।

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

১. অনির্ভরশীল চল (Independent Variable)

পরীক্ষণকারী পরীক্ষণপাত্রের উপর যে চলের প্রভাব লক্ষ করেন তাই হলো অনির্ভরশীল চল। এটি উদ্দীপক চল বা নিরপেক্ষ চল নামেও পরিচিত।

ওয়াইনী ওয়াইটেন (Wayne Weiten)-এর মতে, "একটি অনির্ভরশীল চল হলো এমন একটি শর্ত বা ঘটনা যা একজন পরীক্ষণকারী পরিবর্তন করে অন্য চলের উপর এর প্রভাব লক্ষ করেন।"

(An independent variable is a condition or event that an experimenter varies in order to see its impact on another variable. উৎস: Psychology: Brooks/Cole Publishing Company; 1989; P. 39.)

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

ক্লিফোর্ড টি. মর্গান ও সাথীরা বলেছেন, "একটি অনির্ভরশীল চল হলো পরীক্ষণকারী কর্তৃক নির্ধারিত সেই সকল শর্ত যা আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।" (An independent variable is a condition set or selected by an experimenter to see whether it will have an effect on behavior. উৎস: Introduction to Psychology; Tata McGrow-Hill Publishing Company Ltd.; 1993; P. 9)

জন সি রাচ বলেন, "পরীক্ষণ কাঠামোর পরিমাপই হলো অনির্ভরশীল চল।" (Independent variables are the measures of the experimental treatment. উৎস: Psychology; Wadsworth Publishing Company; 1984; P. 35.)

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

গবেষক প্রাণীর আচরণের উপর যে সকল চলের প্রভাব লক্ষ করেন সে সকল চলই হচ্ছে অনির্ভরশীল চল। গবেষক তার ইচ্ছানুসারে অনির্ভরশীল চলকে হ্রাস বা বৃদ্ধি করে থাকেন। মনোবিজ্ঞানিগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেন, এজন্য মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় সাধারণত অনির্ভরশীল চল হলো উদ্দীপক। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় অনির্ভরশীল চল হলো প্রাকৃতিক উদ্দীপক যা ইন্দ্রিয়সমূহের উপর আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম। মনোবিজ্ঞানিগণ এজন্য শব্দ, আলোকরশ্মি, বিদ্যুৎপ্রবাহ ইত্যাদিকে উদ্দীপক বা অনির্ভরশীল চল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক: একজন গাড়ি চালক শহরের রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে ট্রাফিক মোড়ে লাল আলো জ্বলে উঠায় গাড়ি থামিয়ে দিল এবং অল্প সময় পরে সবুজ আলো জ্বলে উঠায় গাড়ি চালাতে শুরু করল। এখানে আলোর উপস্থাপন অর্থাৎ লাল বা সবুজ আলো হচ্ছে অনির্ভরশীল চল। অথবা আমরা দেখতে চাই, কোনো আলোর প্রতি প্রতিক্রিয়াকাল কম। বিভিন্ন বর্ণের আলো (লাল, সবুজ, নীল, বেগুনি প্রভৃতি) উপস্থাপন করা হবে। আলো উপস্থাপনের সাথে সাথে পরীক্ষণপাত্র প্রতিক্রিয়া করবে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণের আলোর উপস্থাপন হলো অনির্ভরশীল চল। অনির্ভরশীল চল সবসময় পরীক্ষণকারীর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

কোনো পরীক্ষণে একটি অনির্ভরশীল চলের প্রভাব নিরূপণ করার জন্য পরীক্ষণকারী পরীক্ষণপাত্রদের দু'দলে ভাগ করেন যাদের অনির্ভরশীল চলের নিরীখে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হয়। এ দল দুটি হলো:

(১) পরীক্ষণ দল (Experimental group) ও

(২) নিয়ন্ত্রিত দল (Control group) ।

পরীক্ষণ দল সে সকল পরীক্ষণপাত্র নিয়ে গঠিত হয় যারা অনির্ভরশীল চলের নিরীখে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা পেয়ে থাকে। নিয়ন্ত্রিত দল, অন্যদিকে, একই ধরনের পরীক্ষণপাত্র নিয়ে গঠিত, কিন্তু পরীক্ষণ দল যে বিশেষ ব্যবস্থা পেয়ে থাকে তা তারা পায় না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা শিক্ষণের উপর শব্দযুক্ত পরিবেশের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে চাই। এক্ষেত্রে একদল পরীক্ষণপাত্রকে শব্দযুক্ত পরিবেশে এবং অন্যদলকে শব্দমুক্ত পরিবেশে শিক্ষণ করতে দেয়া হয়। যে দলের ক্ষেত্রে শব্দযুক্ত পরিবেশ থাকবে তারা পরীক্ষণ দল এবং যাদের ক্ষেত্রে শব্দযুক্ত পরিবেশ থাকবে না তারা নিয়ন্ত্রিত দল বলে গণ্য হবে।

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

২. নির্ভরশীল চল (Dependent Variable)

যে চলকে তার উপস্থিতি বা সৃষ্টির জন্য অন্য কোনো চলের উপর নির্ভর করতে হয়, তাকে নির্ভরশীল চল বা আপেক্ষী চল বলা হয়।

ওয়াইনী ওয়াইটেন (Wayne Weiten) এর মতে, "নির্ভরশীল চল হলো সেই চল যা অনিভর্রশীল চল প্রয়োগের ফলে প্রভাবিত হয় বলে মনে করা হয়।"

(The dependent variable is the variable that is thought to be affected by the manipulation of the independent variable. উৎস: Psychology; Brooks/Cole Publishing Company; 1989; P. 39.)

ক্লিফোর্ড টি. মর্গান ও সাথীরা বলেছেন, "কোনো পরীক্ষণে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর আচরণই হলো নির্ভরশীল চল।" (The dependent variable is the behavior of the person or animal in the experiment. উৎস: Introduction to Psychology; Tata McGrow-Hill Publishing Company Ltd.; 1993; P. 9.)

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

অনির্ভরশীল চল পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণীর আচরণে যেসব পরিবর্তন ঘটে, সেগুলোকে বলা হয় নির্ভরশীল চল। নির্ভরশীল চল অনির্ভরশীল চল কর্তৃক সৃষ্ট; প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় জীবের প্রতিক্রিয়া বা সাড়াই হলো নির্ভরশীল চল। উপরোক্ত উদাহরণে দেখা যায় যে, চালক লাল আলো দেখে গাড়ি থামিয়ে দেয় এবং সবুজ আলো জ্বলে উঠলে গাড়ি চালাতে শুরু করে। এখানে গাড়ি থামানো বা পুনরায় চালানো নির্ভর করছে লাল বা সবুজ আলো জ্বলে উঠার উপর। তাই গাড়ি থামানো বা গাড়ি পুনরায় চালানো হচ্ছে নির্ভরশীল চল।

আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক: মনে করি, একটি কবিতা যত বেশিবার আবৃত্তি করা যাবে তত বেশি মুখস্থ হবে। কবিতাটির কতটুকু মুখস্থ হলো তা নির্ভর করে কতবার আবৃত্তি করা হয়েছে তার উপর। সুতরাং মুখস্থ করার পরিমাণ হলো নির্ভরশীল চল। উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় উদাহরণের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন আলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পরীক্ষণপাত্রের যে সময় লাগে তা অর্থাৎ পরীক্ষণপাত্রের প্রতিক্রিয়াকালই হলো নির্ভরশীল চল। নির্ভরশীল চল সব সময় পরীক্ষণপাত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

৩. মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী চল (Intervening Variable)

এ চল অনির্ভরশীল ও নির্ভরশীল চলের মধ্যে সংযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। আমরা জানি, ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের ফলেও আচরণের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে যে সব চলের উদ্ভব হয়, তাকে মধ্যবর্তী চল বলে।

মান, ফারনল্ড এবং ফারনল্ড বলেন, "মধ্যমবর্তী চল হলো একটি ঘটনা যা ব্যক্তির মধ্যে ঘটে যাওয়া অনুমান সম্পর্কিত উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ার একটি বিষয়, যার দ্বারা প্রতিক্রিয়া নির্ধারিত অথবা প্রভাবিত হয়।"

(Intervening variable is an event inferred to occur within the organism between the stimulation and response in such a way as to determine or influence the response. উৎস: Introduction to Psychology; Houghton Mifflin Company, Boston; 1969; P. 681)

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

এটা অন্তর্বর্তী বা জৈবিক চল নামেও পরিচিত। যেমন, বয়স, লিঙ্গ, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা, প্রেষণা ইত্যাদি মধ্যবর্তী চল। উপরোক্ত উদাহরণে কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে ৬০ বছরের বৃদ্ধের তা মুখস্থ করতে যে সময় লাগবে, ২৫ বছরের যুবকের তা নাও লাগতে পারে। আবার লিঙ্গভেদে অর্থাৎ বালক ও বালিকার ক্ষেত্রেও মুখস্থ করার সময়ের তারতম্য হতে পারে।

এবার একই বয়সের এবং একই লিঙ্গের পরীক্ষণপাত্র নেয়া হলো। কিন্তু একজন এক ঘণ্টা আগে খাবার খেয়েছে, অন্যজন ১০ (দশ) ঘণ্টা আগে। কবিতা মুখস্থের ক্ষেত্রে কি আমরা উভয় পরীক্ষণপাত্র থেকে একই রকম ফলাফল আশা করব? ১০ ঘণ্টা ধরে যে কোনো খাবার খায়নি তার কবিতা মুখস্থ করার কোনো আগ্রহ বা ইচ্ছা থাকার কথা নয়। তাই দু'জনের নিকট একই ফলাফল আশা করা যায় না। কারণ এক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী চল 'প্রেষণা' কাজ করেছে। অন্তর্বর্তী চলও পরীক্ষণপাত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

৪. বাহ্যিক চল (Extraneous Variable)

বাহ্যিক পরিবেশ থেকে যে চলের উদ্ভব হয়, তাকে বাহ্যিক চল বলা যেতে পারে। এটি পরিবেশগত চল নামেও পরিচিত। এ চলগুলো পরীক্ষণকারী কর্তৃক আরোপিত নয় অথচ এগুলো ঘটনাক্রমে পরীক্ষণের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে এবং আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় বাহ্যিক বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়াইনী ওয়াইটেন-এর মতে, "বাহ্যিক চল হলো যেকোনো চল যা অনির্ভরশীল চল থেকে আলাদা, যা একটি বিশেষ গবেষণায় নির্ভরশীল চলের উপর প্রভাব বিস্তার করে।"

(Extraneous variables are any variables other than the independent variable that seems likely to influene the dependent variable in a specific study. উৎস: Psychology; Brocks/Cole Publishing Company; 1989;P. 40)

চল ও চলের শ্রেণিবিভাগ

কোনো পরীক্ষণে বাহ্যিক চলে অনির্ভরশীল চল ও নির্ভরশীল চল ব্যতীত অন্যান্য চল আছে, যেগুলো কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল চলকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন- গবেষণাগারের তাপমাত্রা, পারিপার্শ্বিক এলাকার গোলমাল, মিছিলের শ্লোগান প্রভৃতি বাহ্যিক চলের উদাহরণ। উপরোক্ত উদাহরণে, মুখস্থ করার সময় যদি কক্ষের তাপমাত্রা খুব বেশি থাকে অথবা কক্ষের বাইরে যদি তখন তুমুল হট্টগোল চলতে থাকে, তাহলে তা কবিতাটি মুখস্থ করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই এসব চলের প্রভাব থেকে আচরণ বা পর্যবেক্ষণীয় ঘটনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মনোবিজ্ঞানে গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

টপিক – ০৪ পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

টপিক ০৪: পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত মূল পদ্ধতি হলো পরীক্ষণ পদ্ধতি। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে সুব্যবস্থিত ও সুপরিকল্পিত অবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে মূলত পরীক্ষণ পদ্ধতিকেই বোঝায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সকল বৈশিষ্ট্যই পরীক্ষণ পদ্ধতিতে বিদ্যমান।

উডওয়ার্থ এবং শ্লোজবার্গ (১৯৫৪) পরীক্ষণ পদ্ধতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন:

(১) পরীক্ষণকারী পর্যবেক্ষণীয় ঘটনাটি যথাযথ নিয়মে যখন খুশি তখনই সৃষ্টি করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ কার্য সম্পাদন করতে পারেন।

(২) তিনি একই নিয়মে একই রকম অবস্থা বার বার পুনরুৎপাদন করে ফলাফল যাচাই করতে পারেন।

(৩) তিনি কতগুলো অবস্থার পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি করে ফলাফলের পরিবর্তন লক্ষ করতে পারেন।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

পরীক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. প্রায়োগিক সংজ্ঞা (Operational Definition): যে সংজ্ঞা নির্দিষ্ট বিষয়কে সহজে ও স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারে তাকে প্রায়োগিক বা কার্যকরী সংজ্ঞা বলে। অর্থাৎ যে বিষয়ের উপর অনুধ্যান করা হচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে সহজে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব এমন ব্যাখ্যা প্রদান করাই হচ্ছে প্রায়োগিক সংজ্ঞা প্রদান। বিজ্ঞানী যখন কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন তখন তিনি উক্ত বিষয়ের একটি প্রায়োগিক সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রায়োগিক সংজ্ঞা ছাড়া গবেষণার বিষয়বস্তু অস্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোনো দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দ শব্দসমূহের প্রায়োগিক সংজ্ঞা প্রদান পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য।

২. বস্তুনিষ্ঠতা (Objectivity): পরীক্ষণ পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বস্তুনিষ্ঠতা। পরীক্ষণ পদ্ধতি একটি বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি। এখানে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্থান নেই। এ পদ্ধতিতে বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয়। আনুষঙ্গিক নিয়মাবলি অভিন্ন থাকলে স্থান-কাল-পাত্র ও পরীক্ষণকারী ভেদে গবেষণালব্ধ ফল অভিন্ন রাখার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়াসের নামই বস্তুনিষ্ঠতা বা ব্যক্তিনিরপেক্ষতা। অর্থাৎ পরীক্ষণের পরিকল্পনা ও আয়োজন পরীক্ষণ ও পরীক্ষণকারী ভেদে অভিন্ন রেখে পরীক্ষণের ফলাফলকে পরীক্ষণকারীর প্রভাবমুক্ত রাখাই ব্যক্তিনিরপেক্ষতা।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

৩. প্রয়োজন অনুযায়ী চলের প্রয়োগ (Manipulation of variables): পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পরীক্ষণকারী প্রয়োজন অনুযায়ী চল এর মাত্রা, পরিমাণ বা শক্তি পরিবর্তন করে চল প্রয়োগ করেন। তিনি প্রয়োজন মতো যে কোনো অনির্ভরশীল চলের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে নির্ভরশীল চলের ওপর কী প্রভাব পড়ে তা পর্যবেক্ষণ করেন। প্রয়োজন অনুযায়ী চলের পরিবর্তন পরীক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৪. নিয়ন্ত্রণ (Control): পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষণ পদ্ধতির এক. গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নিয়ন্ত্রণ বলতে মূলত পরীক্ষণাধীন চলের কার্যকারিতাকে পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে সাধারণত অনির্ভরশীল চলের সঙ্গে নির্ভরশীল চলের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে সব রকম অবাঞ্ছিত চলকে ধ্রুব রেখে পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করা হয়। গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৫. পুনরাবৃত্তি (Repetition): পরীক্ষণ পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তি। কোনো বিষয় বা ঘটনার উপর বার বার পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করাকে পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তি বলা হয়। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পূর্বে পরীক্ষিত কোনো বিষয়কে পুনরায় পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক গবেষণাকার্য পরিচালনা করা হয়।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

৬. সাধারণীকরণ (Generalization): অল্প সংখ্যক দৃষ্টান্ত গবেষণাপূর্বক বিশ্লেষণলব্ধ ফলাফল স্থান-কাল-পাত্রভেদে*এক জাতীয় সকল ক্ষেত্রের জন্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করাকে সাধারণীকরণ বলে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় গবেষক পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে মানুষ বা প্রাণীর প্রতিনিধিত্বমূলক এক বা একাধিক দলের উপর গবেষণা করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সকল মানুষ বা প্রাণী সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব বা সূত্র প্রণয়ন করেন।

৭. যথার্থতা প্রমাণ (Verification): পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যথার্থতা প্রমাণ, বিজ্ঞানিগণ বার বার একই পরীক্ষণ সম্পাদন করে ফলাফলের সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন। বার বার সম্পাদিত একই পরীক্ষণের ফলাফলসমূহের মধ্যে পার্থক্য না থাকাই পরীক্ষণের যথার্থতা। কেউ পরীক্ষণের ফল প্রকাশ করার পর অন্যেরা তা অনুরূপভাবে পরীক্ষণ করে ঐ ফলাফলের সত্যতা যাচাই করতে পারেন। ফলাফলের সত্যতা যাচাই পরীক্ষণ পদ্ধতির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৮. পরিসংখ্যানগত পরিমাপ (Statistical measure): পরীক্ষণ পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানের বিভিন্ন পরিমাপ ব্যবহার করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহে বিভিন্ন নকশা ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত উপাত্ত কেন্দ্রীয় প্রবণতা, বিচ্যুতির পরিমাপ, সহ-পরিবর্তন, নির্ভরণ প্রভৃতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়। পরিসংখ্যানগত পরিমাপসমূহের মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগপূর্বক সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহারের সুবিধা অন্যান্য পদ্ধতিতে সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহারের সুবিধা অপেক্ষা বেশি এবং তা বেশি নির্ভরযোগ্য।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

নিয়ন্ত্রণ

পরীক্ষণের একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো নিয়ন্ত্রণ। পরীক্ষণের নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন এক কৌশলকে বোঝায় যা সম্ভাব্য ভীতিসমূহকে দূর করে। গবেষণার ক্ষেত্রে ভীতি প্রদানকারী শর্তগুলো কী এবং সেগুলো কীভাবে দূর করে পরীক্ষণে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান অর্জন করা যায়-সেটিই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ। কাজেই বলা যায়, নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে তুলনার একটি আদর্শ ব্যবস্থা।

ক্লিফোর্ড টি. মর্গান ও সাথীরা পরীক্ষণে নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝিয়েছেন, "এটি পরীক্ষণ পদ্ধতির এমন একটি বৈশিষ্ট্য যেখানে বাহ্যিক উপাদানসমূহ যা নির্ভরশীল চলকে প্রভাবিত করে স্থির বা বাতিল করে দেয় এমনভাবে যে, যেখানে সুনির্দিষ্ট অনির্ভরশীল চলকে পরিবর্তনের জন্য অনুমোদন করে।" (A characteristic of the experimental method in which extraneas factor which might affect the dependent variable are held constant or cancelled out in some way so that only the specified indenpendent variables are allowed to change. উৎস: Introduction to Psychology; Tata McGrow-Hill Publishing Company Ltd.; 1993; P. G-6.)

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

নিয়ন্ত্রণ

মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণে আদর্শমানের সাহায্যে বিশেষ একটি অনির্ভরশীল চলের প্রভাব তুলনা করা হয়। এ ঘটনাটিকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থা বলে। আবার নিয়ন্ত্রিত অবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে দুটো অবস্থার মধ্যে তুলনা করা যায় এবং অবাঞ্ছিত চলকে বর্জন করা যায়। এভাবে পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দল সৃষ্টির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। পরীক্ষণ দল সেই সকল পরীক্ষণপাত্র নিয়ে গঠিত হয় যারা অনির্ভরশীল চলের নিরীখে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা পেয়ে থাকে। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত দল একই ধরনের পরীক্ষণপাত্র নিয়ে গঠিত, কিন্তু পরীক্ষণ দল যে বিশেষ ব্যবস্থা পেয়ে থাকে তা তারা পায় না। সংক্ষেপে বলা যায়, যে দলে গবেষক হস্তক্ষেপ (treatment) করে এবং অনির্ভরশীল চল প্রয়োগ করে সেটি পরীক্ষণ দল এবং যে দলে হস্তক্ষেপ করা হয় না এবং অনির্ভরশীল প্রয়োগ করা হয় না সেটিকে নিয়ন্ত্রিত দল বলে। পরীক্ষণে নিয়ন্ত্রিত দল তুলনার একটি ভিত্তি স্থাপন করে, ফলে পরীক্ষণ দলে যে পরিবর্তন আসে তা নির্ভরশীল চল হিসেবে ফলাফল নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা শিক্ষণের উপর শব্দযুক্ত পরিবেশের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে চাই।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

নিয়ন্ত্রণ

এক্ষেত্রে একদল পরীক্ষণপাত্রকে শব্দযুক্ত পরিবেশে এবং অন্য দলকে শব্দমুক্ত পরিবেশে শিক্ষণ করতে দেয়া হয়। যে দলের ক্ষেত্রে শব্দযুক্ত পরিবেশ থাকবে তারা পরীক্ষণ দল যাদের ক্ষেত্রে শব্দযুক্ত পরিবেশ থাকবে না তা নিয়ন্ত্রিত দল বলে গণ্য হবে। পরীক্ষণমূলক হস্তক্ষেপের পূর্বে দুটি দল সমমানের এবং সমমর্যাদার হলেও পরীক্ষণ পরবর্তী পার্থক্যকে হস্তক্ষেপের অনিবার্য ফল হিসেবে ধরা যায় এবং বলা যায় যে, হস্তক্ষেপের কারণে পরীক্ষণ উত্তর পার্থক্য ঘটতে পারে।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

নিম্নে ছকে বিষয়টি দেখানো হলো :

নিয়ন্ত্রিত দলের প্রয়োগ		
দল	হস্তক্ষেপ	শিক্ষণ
পরীক্ষণ দল	অনির্ভরশীল চলের উপস্থিতি	শব্দযুক্ত পরিবেশ
নিয়ন্ত্রিত দল	অনির্ভরশীল চলের অনুপস্থিতি	শব্দমুক্ত পরিবেশ

পরীক্ষণের উদ্দেশ্য হলো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে একটি চলের সাথে অন্য একটি চলের সম্পর্ক নির্ণয় করা। নিয়ন্ত্রণ হলো পরীক্ষণের একটি অপরিহার্য শর্ত। পরীক্ষণে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সকল অবাঞ্ছিত চলকে ধ্রুব রেখে একটি মাত্র চল (অনির্ভরশীল চল)-এর প্রভাবে মানুষ বা প্রাণীর আচরণ (নির্ভরশীল চল) অনুধ্যান করা হয়। পরীক্ষণের নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায়, অনির্ভরশীল চলের সঙ্গে নির্ভরশীল চলের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে সব রকম অবাঞ্ছিত চলকে ধ্রুব রেখে পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করা। অর্থাৎ পরীক্ষণকারী যখন কোনো ব্যক্তির বিশেষ আচরণের উপর একটি চলের প্রভাব দেখতে চান তখন পরীক্ষণের পরিবেশটা এমন হওয়া উচিত যে, ঐ মুহূর্তে অনির্ভরশীল চল ছাড়া আর কোনো চল ব্যক্তির পরীক্ষণীয় আচরণের উপর উদ্দীপক হিসেবে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। বাস্তবিক পক্ষে পরীক্ষণের নিয়ন্ত্রণ বলতে মূলত চলের নিয়ন্ত্রণকেই বোঝায়।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

নিয়ন্ত্রণ

উদাহরণস্বরূপ, কোনো পরীক্ষণকারী, শিক্ষণে পারিপার্শ্বিক গোলমালের কোনো প্রভাব আছে কিনা দেখতে চান। প্রথমে তিনি প্রকল্প প্রণয়ন করলেন- 'পারিপার্শ্বিক গোলমাল শিক্ষণকে বিলম্বিত করে।' এখানে পারিপার্শ্বিক গোলমাল হলো অনির্ভরশীল চল এবং শিক্ষণ হলো নির্ভরশীল চল। তিনি সমান মেধাসম্পন্ন এবং সমবয়সী দুই দল ছাত্র নিয়ে এক দলকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এবং অপর দলকে গোলমালপূর্ণ পরিবেশে কিছু অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করতে দিলেন। এছাড়া দুই দলের অনুশীলন কক্ষের সমস্ত উপাদান তথা কক্ষের তাপমাত্রা, বসার ব্যবস্থা, আলোর উজ্জ্বলতা ইত্যাদি একই রকম রাখা হলো। নির্দিষ্ট সময় অনুশীলনের পর দুই দলের শিক্ষণে যদি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে এর কারণ হিসেবে গোলমালপূর্ণ পরিবেশকে দায়ী করা যাবে। কারণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষণটি পরিচালনা করা হয়েছে।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

চলের সুবিধাজনক ব্যবহার

চল শব্দটি দ্বারা কতগুলো বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, যাকে পরিমাপ বা পরিচালনা করা যায়। ব্যাপকার্থে চল হলো এমন একটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ যার অনেক মূল্যমান থাকতে পারে। মনোবিজ্ঞানে সাধারণত পরীক্ষণকারী অনির্ভরশীল চল প্রয়োগ করেন এবং পরীক্ষণের ফলাফলে কী পরিবর্তন আসে তা লক্ষ করেন। পরীক্ষণকারী পরীক্ষণে যে চলটি ব্যবহার করেন সেটি হলো অনির্ভরশীল চল এবং অনির্ভরশীল চল প্রয়োগের ফলে পরীক্ষণে যে ফলাফল আসে সেটি হলো নির্ভরশীল চল। উদ্দীপক বা কারণটি হলো অনির্ভরশীল চল এবং প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল হলো নির্ভরশীল চল। একজন গাড়ি চালক শহরের রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে হঠাৎ ট্রাফিক মোড়ে লাল বাতি জলে উঠায় গাড়ি থামিয়ে দিল। এক্ষেত্রে লাল আলোর উপস্থাপন হচ্ছে অনির্ভরশীল চল এবং গাড়ি থামানো হলো নির্ভরশীল চল। কয়েক মিনিট পরে সবুজ আলো জ্বলে উঠল এবং গাড়ি চলতে শুরু করল। এক্ষেত্রে সবুজ আলো জ্বলা অনির্ভরশীল চল এবং গাড়ি চলতে শুরু করা হলো নির্ভরশীল চল ।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

চলের সুবিধাজনক ব্যবহার

পরীক্ষণকারী যখন একটি উদ্দীপকের সংগে প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক নির্ণয় করতে চান, তখন তিনি বিভিন্নভাবে উদ্দীপকটি পরিবর্তন করতে পারেন। পরীক্ষণকারী যেকোনো উদ্দীপককে খুশিমতো উপস্থিত করে, অনুপস্থিত রেখে অথবা উদ্দীপকটির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে আচরণের উপর এসব অবস্থার প্রভাব লক্ষ করতে পারেন।

অনেক সময় পরীক্ষণপাত্রের বৈশিষ্ট্য বা অভ্যন্তরীণ চলকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। যেমন ক্ষুধার অনুভূতি শিক্ষণকে প্রভাবিত করে কিনা তা আমরা দেখতে চাই। এক্ষেত্রে অনির্ভরশীল চল ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ক্ষুধা হলো অভ্যন্তরীণ চল এবং এটিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাই কতগুলো পূর্বগামী অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খাদ্য প্রদানের সময়সূচি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ চল নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষণপাত্রকে উপর্যুক্ত নির্দেশনা প্রদান করে অভ্যন্তরীণ প্রেষণা বা প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

চলের সুবিধাজনক ব্যবহার

চল নিয়ন্ত্রণের কৌশল

Techniques for controlling variables

পরীক্ষণ পরিচালনার সময় যে সকল অবাঞ্ছিত চলের নির্ভরশীল চলের উপর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে, সেসব চলের প্রভাব থেকে পরীক্ষণকে মুক্ত রাখার কতগুলো ব্যবস্থা বা কৌশল রয়েছে। নিচে চল নিয়ন্ত্রণের প্রধান কৌশলসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. অপসারণ (Elimination): যে সকল অবাঞ্ছিত চল নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, পরীক্ষণ পরিস্থিতি থেকে সেগুলোকে বর্জন বা অপসারণ করে নির্ভরশীল চলকে ঐ চলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হয়। যেমন, গবেষণা করার সময় বাইরের আওয়াজ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা থাকলে পরীক্ষণটি শব্দ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে করা দরকার। অথবা আলো (Light) যদি কোনো পরীক্ষণের ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহলে আলোকিত কক্ষ বর্জন করে পরীক্ষণটি অন্ধকার কক্ষে পরিচালনা করা যেতে পারে।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

চলের সুবিধাজনক ব্যবহার

২. অবস্থার ধ্রুবকতা বা সমতা (Constancy of Conditions): সব চলকে সব সময় পরীক্ষণ পরিবেশ থেকে অপসারণ করা যায় না। এ সকল চলকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে লক্ষ রাখতে হবে যে, পরীক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকল পরীক্ষণপাত্রের উপরই যেন এগুলো অপরিবর্তনশীলভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন, পরীক্ষণপাত্রের প্রতি নির্দেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যার উপর পরীক্ষণের ফলাফল বহুলাংশে নির্ভর করে। নির্দেশাবলি মুখে বলতে গেলে কোনো বিশেষ দিক বাদ পড়তে পারে বা বিভিন্ন পরীক্ষণপাত্রের নিকট নির্দেশাবলি বলা হুবহু একই রকম নাও হতে পারে। তাই পরীক্ষণ পরিস্থিতির অপরিবর্তনশীলতা রক্ষা করার জন্য সকল পরীক্ষণপাত্রকে একই লিখিত নির্দেশাবলি প্রদান করতে হবে। আবার পরীক্ষণের 'সময়' একটি বাহ্যিক চল এবং সময়কে বাদ দেওয়া যায় না। তাই সব পরীক্ষণপাত্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষণ পরিচালনা করা উচিত। এমনিভাবে আলোর পরিমাণ, অন্যান্য উদ্দীপক, যন্ত্রপাতি, নির্দেশাবলি ইত্যাদি প্রসঙ্গে সব পরীক্ষণপাত্রের বেলায় সমান, অভিন্ন ও অপরিবর্তিত অবস্থা নিশ্চিত রাখা আবশ্যক।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

চলের সুবিধাজনক ব্যবহার

৩. তুল্যমূল্যায়ন বা ভারসাম্য সৃষ্টি (Balancing): এমন কতগুলো অবাঞ্ছিত চল আছে যেগুলোকে অপসারণ বা অবস্থার সমতাকরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম কৌশল হলো ভারসাম্য সৃষ্টি করা। এ পদ্ধতিতে সকল বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমান সমান দুটি দল গঠন করা হয়। একটি দলকে পরীক্ষণ দল অন্যদলকে নিয়ন্ত্রিত দল বলা হয়। এ দুটি দল সব শর্তের দিক থেকে সমান বা সমতুল্য থাকবে; পার্থক্য শুধু এই যে, পরীক্ষণ দলে অনির্ভরশীল চল প্রয়োগ করা হয় কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দলে উক্ত চল প্রয়োগ করা হয় না। তাই দুটি দলের নির্ভরশীল চলের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে সেজন্য শুধুমাত্র অনির্ভরশীল চলকেই দায়ী করা হয়। নির্ভরশীল চলের পার্থক্য তুলনার জন্য নিয়ন্ত্রিত চল ব্যতীত অন্যসব দিক থেকে পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দলকে সমমানে গঠন করার মাধ্যমেই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি পরীক্ষণের জন্য ৩০ জন পুরুষ ও ৪০ জন মহিলা পাওয়া গেল। লিঙ্গভেদে আচরণে তারতম্য ঘটতে পারে। তাই লিঙ্গের (sex) প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত দল এমনভাবে গঠন করতে হবে যেন প্রতি দলে ১৫ জন পুরুষ ও ২০ জন মহিলা অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

চলের সুবিধাজনক ব্যবহার

এ জন্য যে ধরনের নক্‌শা প্রণয়ন করা হয় তার নমুনা নিচে প্রদান করা হলো :

দল / লিঙ্গ	পরীক্ষণ দল	নিয়ন্ত্রিত দল
পুরুষ	১৫	১৫
মহিলা	২০	২০

চিত্র ৭·১ : ভারসাম্য সৃষ্টি

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

চলের সুবিধাজনক ব্যবহার

৪. প্রতি তুল্যমূল্যায়ন বা প্রতিভারসাম্য সৃষ্টি (Counter Balancing): কোনো পরীক্ষণে যখন একই পরীক্ষণপাত্রকে একাধিক পরীক্ষণমূলক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষণপাত্রের প্রথম অধিবেশনের অভিজ্ঞতা তার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলশ্রুতিতে ফলাফলে ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। প্রতিভারসাম্য পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক অবস্থার প্রভাব সব পরীক্ষণপাত্রের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা সম্ভব। প্রতিভারসাম্য পদ্ধতিতে অনুশীলন 'AB' 'BA' এই আকারে প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে পরীক্ষণাধীন একটি শর্তকে একবার পরীক্ষণ দলে এবং আবার নিয়ন্ত্রিত দলে রেখে বিপরীতক্রমে পরীক্ষণাদি পরিচালনা করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন পরীক্ষণপাত্রকে কোনো কাজে বাম হাতে ২০ বার অনুশীলন করার পর তাকে ডান হাতে ২০ বার অনুশীলন করতে হবে। এভাবে অনুশীলন করতে করতে বাম হাতে তার একটা অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে যার প্রভাব ডান হাতে পড়বে। প্রতিভারসাম্য পদ্ধতিতে প্রথমে বাম হাতে ১০টি অনুশীলন দিয়ে ডান হাতে ১০টি অনুশীলন দেওয়া হয়। কিছু সময় বিরতির পর আবার ডান হাতে ১০টি অনুশীলন দিয়ে বাম হাতে ১০টি অনুশীলন দেওয়া হয়। এভাবে বাম হাতে অনুশীলনের প্রভাব ডান হাতে পড়ে এবং পরবর্তীতে ডান হাতের প্রভাব বাম হাতে পড়ে। ফলে এ দ্বিমুখী প্রভাবের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার যোগফল শূন্য হয়ে যায়।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

চলের সুবিধাজনক ব্যবহার

প্রতি তুল্যমূল্যায়নের নক্‌শা নিম্নরূপভাবে করা যেতে পারে :

অনুশীলন সংখ্যা	হাতের ব্যবহার			
	বাম	ডান	ডান	বাম
অনুশীলন	১	১	১	১
	২	২	২	২
	৩	৩	৩	৩
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	১০	১০	১০	১০

চিত্র ২·২ : প্রতিভারসাম্য সৃষ্টি

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

চলের সুবিধাজনক ব্যবহার

পরীক্ষণে চল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দৈবায়ন বা দৈব নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর পদ্ধতি। প্রাথমিকভাবে দৈবায়নকে নিয়ন্ত্রণের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসেবে অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কারণ হিসেবে বলা যায়, গবেষক বা পরীক্ষণকারী নিয়ন্ত্রণের নামে অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ প্রত্যেক পর্যায়ে পরীক্ষণপাত্রকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নিয়োগ দিলে এটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে অন্তর্নিহিত কোনো ত্রুটি চলসমূহের মধ্যে গুরুতর কোনো ভুলের জন্ম দিতে পারে না। দৈবচয়নের মাধ্যমে চলসমূহকে বিভ্রান্ত করার সকল উৎস বাতিল হয়ে যায়। ক্রাইডার এবং সাথীগণ বলেন, "দৈবচয়ন নিশ্চিত করে যে, আরম্ভকারী দলের সাথে পরীক্ষণপাত্রদের বিভিন্ন দলের মধ্যে তুলনীয় হবে যদি পরীক্ষণপাত্রদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সমভাবে বণ্টিত হয়।"

(Random assaignment ensures that any differences among subjects are distributed evenly among the groups, making different groups of subjects comparable to begin with. উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 15)

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

চলের সুবিধাজনক ব্যবহার

৫. দৈবচয়ন (Randomization): এমন কিছু অবাঞ্ছিত, চল আছে যা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না এবং পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলোর সাহায্যেও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, সেক্ষেত্রে দৈবচয়ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরীক্ষণে পরীক্ষণকারীর 'পক্ষপাতিত্ব' একটি অবাঞ্ছিত চল। পরীক্ষণপাত্র নির্বাচন, পরীক্ষণপাত্রদের বিভিন্ন দলে বণ্টন, উদ্দীপক উপস্থাপনের ধারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরীক্ষণকারীর পক্ষপাতিত্ব ঘটতে পারে। এ সকল পরিস্থিতিতে অবাঞ্ছিত চল নিয়ন্ত্রণের জন্য দৈবচয়ন পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দেশ্যবিহীন কৌশলে নমুনা নির্বাচনের পন্থা অবলম্বনকেই দৈবচয়ন পদ্ধতি বলে।

দৈবচয়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষণপাত্রের নিয়োগ প্রত্যেক পর্যায়ে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয় যাতে প্রত্যেক পর্যায়ে প্রত্যেক পরীক্ষণপাত্রের নির্বাচিত হবার সমান এবং নিরপেক্ষ সম্ভাবনা থাকে। দৈব নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য সুবিধা হলো, সংশ্লিষ্ট চলসমূহ দ্বারা পরীক্ষণের ফলাফল কেবলমাত্র জৈব ঘটনার মাধ্যমে প্রভাবিত হতে পারে। দৈবচয়ন চল নিয়ন্ত্রণের একটি সহজ ও উত্তম পদ্ধতি।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

দৈবায়ন

পরীক্ষণে চল নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দৈবায়ন বা দৈব নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর পদ্ধতি। প্রাথমিকভাবে দৈবায়নকে নিয়ন্ত্রণের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসেবে অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কারণ হিসেবে বলা যায়, গবেষক বা পরীক্ষণকারী নিয়ন্ত্রণের নামে অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ প্রত্যেক পর্যায়ে পরীক্ষণপাত্রকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নিয়োগ দিলে এটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে অন্তর্নিহিত কোনো ত্রুটি চলসমূহের মধ্যে গুরুতর কোনো ভুলের জন্ম দিতে পারে না। দৈবচয়নের মাধ্যমে চলসমূহকে বিভ্রান্ত করার সকল উৎস বাতিল হয়ে যায়।

ক্রাইডার এবং সাথীগণ বলেন, "দৈবচয়ন নিশ্চিত করে যে, আরম্ভকারী দলের সাথে পরীক্ষণপাত্রদের বিভিন্ন দলের মধ্যে তুলনীয় হবে যদি পরীক্ষণপাত্রদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সমভাবে বণ্টিত হয়।"

(Random assaignment ensures that any differences among subjects are distributed evenly among the groups, making different groups of subjects comparable to begin with. উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 15)

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

দৈবায়ন

দৈবায়ন পরীক্ষণে সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষণপাত্রের নিয়োগ প্রত্যেক পর্যায়ে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয় যাতে প্রত্যেক পর্যায়ে প্রত্যেক পরীক্ষণপাত্রের নির্বাচিত হবার সমান ও নিরপেক্ষ সম্ভাবনা থাকে। দৈবায়ন পদ্ধতির বড় সুবিধা হলো, সংশ্লিষ্ট চলসমূহ দ্বারা পরীক্ষণের ফলাফল কেবলমাত্র দৈব ঘটনার মাধ্যমে প্রভাবিত হতে পারে। অর্থাৎ কোনো অনির্ভরশীল চল বাহ্যিক কোনো চল দ্বারা প্রভাবিত হলে তা একমাত্র দৈব ঘটনার মাধ্যমেই সম্ভব। আর এরূপ ত্রুটি কেবলমাত্র পরিসংখ্যানের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।

পরীক্ষণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্যাবলি

দৈবায়ন

বর্তমানে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে দৈবচয়নের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারে। পরিসংখ্যান পদ্ধতি পরীক্ষণপাত্রকে পরীক্ষণের প্রত্যেক পর্যায়ে দৈবচয়নের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করতে পারে। সুতরাং পরীক্ষণের প্রত্যেক পর্যায়ে সকল পরীক্ষণপাত্রকে দৈবচয়নের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা না হলে পরীক্ষণে ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। দৈবচয়নের জন্য পরিসংখ্যানভিত্তিক দৈবচয়ন টেবিল ব্যবহার করতে হবে। দৈবচয়ন পদ্ধতি সাধারণত নিচের দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

(ক) যখন বেশকিছু বাহ্যিক চল পরীক্ষণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে মনে করা হয়, অথচ তা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না।

(খ) যখন বাহ্যিক চল শনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু পূর্বের উল্লিখিত কোনো পদ্ধতির সাহায্যে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। পরীক্ষণপাত্রের প্রেষণার মাত্রা, অতীত অভিজ্ঞতা, তাদের মধ্যকার পরিচিতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক চল দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে পরীক্ষণপাত্র নির্বাচন করে দৈবচয়ন পদ্ধতিতেই তাদের পরীক্ষণমূলক ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থার সম্মুখীন করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন চল পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দলকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত চলের (চলসমূহের) প্রভাব উভয় দলে সমানভাবে পড়ে বলে মনে করা হয়। দৈবচয়ন পদ্ধতিটি চল নিয়ন্ত্রণের একটি সহজ ও উত্তম পদ্ধতি। তাই বিভিন্ন পরীক্ষণকারী এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মনোবিজ্ঞানে গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

টপিক – ০৫ পরীক্ষণের ধাপসমূহ

টপিক ০৫: পরীক্ষণের ধাপসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

কোনো কিছু করার পূর্বে যদি ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে পরিকল্পনা নির্ধারণ করে নেয়া যায়, তাহলে ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানিগণ তাই কোনো পরীক্ষণ শুরু করার পূর্বে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা ঠিক করে নেন এবং সেই অনুযায়ী পরীক্ষণের সবগুলো ধাপ সম্পন্ন করেন। পরীক্ষণের উদ্দেশ্য হলো কোনো সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রকল্প স্থির করে তা সত্য না মিথ্যা যাচাই করা। সেই উদ্দেশ্যে পরীক্ষণটি এমনভাবে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয় যেন ফলাফল থেকে প্রকল্পটি গ্রহণ বা বর্জনের একটি নিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছান যায়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

কোনো কিছু করার পূর্বে যদি ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে পরিকল্পনা নির্ধারণ করে নেয়া যায়, তাহলে ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানিগণ তাই কোনো পরীক্ষণ শুরু করার পূর্বে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা ঠিক করে নেন এবং সেই অনুযায়ী পরীক্ষণের সবগুলো ধাপ সম্পন্ন করেন। পরীক্ষণের উদ্দেশ্য হলো কোনো সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রকল্প স্থির করে তা সত্য না মিথ্যা যাচাই করা। সেই উদ্দেশ্যে পরীক্ষণটি এমনভাবে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয় যেন ফলাফল থেকে প্রকল্পটি গ্রহণ বা বর্জনের একটি নিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছান যায়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

কোনো পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করতে হলে তা কয়েকটি ধাপে পর্যায়ক্রমে সুসম্পন্ন করতে হয়। নিম্নে পরীক্ষণের ধাপসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. সমস্যা শনাক্তকরণ (Identification of the Problem): পরীক্ষণের প্রথম ধাপ হলো সমস্যা শনাক্ত করা। সমস্যা স্থির করার পরই মূলত পরীক্ষণ কার্য শুরু হয়। কোনো বিষয়ের জ্ঞানের অভাব থেকেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। পরীক্ষক যে সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য পরীক্ষণ পরিচালনা করেন সেগুলোর প্রত্যেকটিই এক একটি সমস্যা। সমস্যা ব্যতীত কোনো পরীক্ষণ কল্পনাই করা যায় না।

২. প্রকল্প প্রণয়ন (Framing of Hypothesis): কোনো পরীক্ষণ পরিচালনা করার পূর্বেই উক্ত পরীক্ষণের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে একটা আনুমানিক ধারণা ঠিক করা হয়। এই আনুমানিক ধারণাই হলো প্রকল্প। পরীক্ষণের জন্য যে সমস্যা ঠিক করা হয়েছে তার সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে ফলাফল সম্পর্কিত একটা প্রকল্প গ্রহণ করা পরীক্ষণের অন্যতম প্রধান বিষয়। এখানে পরীক্ষণের ফলাফল প্রকল্পটিকে সমর্থন করতেও পারে আবার নাও করতে পারে।

৩. ধারণা গঠন (Concept Formation): সমস্যা ও প্রকল্প ঠিক করার পর ঐ সমস্যা ও প্রকল্পে যে সকল শব্দ বা পদ ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। কোনো শব্দ বা পদ বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে পারে। তাছাড়া কোনো শব্দ বা পদের একাধিক অর্থও থাকতে পারে। তাই পরীক্ষকের দায়িত্ব হলো তিনি পরীক্ষণে যে সব শব্দ বা পদ ব্যবহার করবেন তা কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেবেন।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

৪. চল শনাক্তকরণ (Identification of Variables): চল শনাক্তকরণ পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। পরীক্ষণে সাধারণত নির্ভরশীল চলের ওপর অনির্ভরশীল চলের প্রভাব লক্ষ করা হয় এবং অন্তর্বর্তী চল ও বাহ্যিক চলকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পরীক্ষণ পরিস্থিতিতে যে উপাদান বা বিষয়ের পরিবর্তন আনা হয় (অনির্ভরশীল চল) এবং এই পরিবর্তন আচরণে যে প্রভাব ফেলে (নির্ভরশীল চল) তা শনাক্ত করতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষণে কোল্টিন্ট অনির্ভরশীল চল এবং কোন্টি নির্ভরশীল চল তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫. চলসমূহের নিয়ন্ত্রণ (Control of variables): চল শনাক্ত করার পরবর্তী কাজ হলো যে সব বাহ্যিক চল নির্ভরশীল চলের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অপসারণ, অবস্থার ধ্রুবকতা, ভারসাম্য সৃষ্টি বা তুল্যায়ন, প্রতিভারসাম্য সৃষ্টি, দৈবচয়ন প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্যে অবাঞ্ছিত চল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

৬. পরীক্ষণপাত্র নির্বাচন এবং বিভিন্ন দলে বণ্টন (Selection and assignment of subjects to - groups): পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি প্রয়োজনীয় ধাপ হলো পরীক্ষণপাত্র নির্বাচন। কোনো পরীক্ষণে একজন পরীক্ষণপাত্রের প্রয়োজন হয়, আবার কখনো একাধিক। একাধিক পরীক্ষণপাত্রের ক্ষেত্রে দৈবচয়ন (Randomization) পদ্ধতিতে তাদের দুটো 'দলে ভাগ করা হয়। একটি পরীক্ষণ দল (যাদের উপর কোনো বিশেষ শর্ত আরোপ করা হয়) এবং অন্যটি নিয়ন্ত্রিত দল (স্বাভাবিক বা নিরপেক্ষ পরীক্ষণপাত্র অর্থাৎ যাদের উপর কোনো শর্ত প্রয়োগ করা হয় না)। পরীক্ষণকারী পক্ষপাতমুক্ত হয়ে পরীক্ষণপাত্র বাছাই করে দল গঠন করেন।

৭. পরীক্ষণের নকশা প্রণয়ন (Designing of Experiment): পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য যে পরিকল্পনা নেয়া হয় তা ছকের আকারে উপস্থাপন করতে হবে। ছকটি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন ছকটি দেখলেই বোঝা যায় যে, অনির্ভরশীল চল কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, নির্ভরশীল চল কীভাবে পরিমাপ করতে হবে, পরীক্ষণে প্রচেষ্টা সংখ্যা কত হবে, পরীক্ষণপাত্রদের কীভাবে বিভক্ত করতে হবে ইত্যাদি। অর্থাৎ কোনো বর্ণনা বা ব্যাখ্যা ছাড়াই পরীক্ষণের নকশা থেকে পরীক্ষণটি কীভাবে পরিচালিত হবে, সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

৮. যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরিকরণ (List of apparatus): পরীক্ষণকার্যে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতে পারে। যে পরীক্ষণ করা হচ্ছে তাতে কী কী যন্ত্র ব্যবহার করা হবে তার একটি তালিকা আগেই তৈরি করতে হবে। যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন তাই পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৯. উপাত্ত সংগ্রহ (Collection of data): পরীক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তার যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা। পরীক্ষণকারীকে খুব সতর্কতার সাথে ব্যক্তিগত মতামত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বর্জন করে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হলে তা সতর্কতার সাথে করতে হবে।

১০. উপাত্তের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ (Statistical analysis of data): উপাত্ত সংগ্রহের পর তার যথাযথ ব্যাখ্যা করা হয়। প্রয়োজনে তথ্য বিশ্লেষণের জন্য পরিসংখ্যানের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। পরিসংখ্যানের সাহায্যে উপাত্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করলে তা বেশি অর্থপূর্ণ ও যথার্থ হয়। উপাত্তসমূহকে লেখচিত্র বা সারণির সাহায্যে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তাছাড়া ফলাফল গড়, মধ্যমা, প্রচুরক, আদর্শ বিচ্যুতি, সহ-সম্পর্ক, নির্ভরণ প্রভৃতি পরিসংখ্যানিক পরিমাপের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

১১. সাধারণ নিয়ম প্রণয়ন (Generalization): পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পরীক্ষণ শেষে একটি সাধারণ নিয়ম প্রণয়ন করা। পরীক্ষণে যে প্রকল্প স্থির করা হয়েছে তার সাথে যদি প্রাপ্ত ফলাফলের মিল পাওয়া যায় বা ফলাফল অনুরূপ হয়, তাহলে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে একটা সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে পরীক্ষককে ঐ জাতীয় আরও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়।

১২. যথার্থতা প্রমাণ (Verification): পরীক্ষণ পদ্ধতির শেষ ধাপ হলো ফলাফলের যথার্থতা প্রমাণ করা। কোনো একটা পরীক্ষণ পরিচালনার পর তার ফলাফলের ভিত্তিতে যে সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় তার যথার্থতা যাচাই করা খুবই প্রয়োজন। গবেষক নিজে অথবা অন্য যে কোনো গবেষক একই পদ্ধতিতে পরীক্ষণ চালিয়ে যদি একই ফল পান তাহলে বলা যায়, যে সাধারণ নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে তা যথার্থ। প্রণীত সাধারণ নিয়ম যথার্থতা প্রমাণের মাধ্যমেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

পর্যবেক্ষণ

গবেষণার একটি মৌলিক তথ্য সংগ্রহ কৌশল হিসেবে পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো বস্তু বা ঘটনা সুশৃঙ্খলভাবে নিরীক্ষণ করাকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বলা হয়। সাধারণত সহজাত কারণে মানুষ সুবিধামতো বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে সঠিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার নিজের কৌতূহল নিবৃত করে। তাই এ হিসেবে প্রতিটি মানুষই একজন পর্যবেক্ষক। তবে যে কোনো পর্যবেক্ষণই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। পর্যবেক্ষণ দৈনন্দিন জীবনের কেবলমাত্র একটি প্রয়োজনীয় তৎপরতাই নয়, বরং এটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রাথমিক একটি উপকরণও বটে।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ একটি বৈজ্ঞানিক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ এটি-

১। সুশৃঙ্খলভাবে পরিকল্পিত থাকে,

২। কোনো গবেষণায় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়,

৩। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়,

৪। সুসংবদ্ধভাবে ধারণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট কৌতূহলের পরিবর্তে সাধারণ ধারণার সাথে সূত্রায়িত করা হয়।

গবেষণায় যেমন এককভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয় তেমনি অন্যান্য কৌশলের সাথে সংযুক্তভাবেও পর্যবেক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করে অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুতির সুবিধার জন্য অনেক সময় পরীক্ষণ সামাজিক জরিপ ইত্যাদির প্রাথমিক স্তরে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তবে এটা ঠিক, অন্যান্য কৌশল হতে পর্যবেক্ষণের একটি সুবিধা হলো এখানে পরিবেশে সংঘটিত ঘটনাটিকে হুবহু ধারণ করা যায়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক ও পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। পর্যবেক্ষককে সদা সতর্ক অবস্থায় কাজ করতে হয়। তাই পর্যাপ্ত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ধারণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ বা বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পর্যবেক্ষণকারীর থাকতে হবে। পর্যবেক্ষণকারী পর্যবেক্ষণাধীন ঘটনা সতর্ক ও যত্নসহকারে ধারণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনে সমগ্র কাজের একটি সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা শুরুতেই প্রণয়ন করে নেন। ফলে পর্যবেক্ষণের ফলাফল পরিমাপযোগ্য হয়ে উঠে।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

সমস্যা

পরীক্ষণ বা গবেষণার মূলে থাকে কোনো সমস্যা বা প্রশ্ন উত্থাপন। সমস্যাকে কেন্দ্র করেই পরীক্ষণ পরিচালিত হয়। কোনো বিষয়ের জ্ঞানের অভাব থেকেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। পরীক্ষণকারী যে সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য পরীক্ষণ পরিচালনা করেন সেগুলোর প্রত্যেকটিই এক একটি সমস্যা। সমস্যা বা প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতীত কোনো পরীক্ষণ কল্পনাই করা যায় না।

ক্রাইডার এবং সাথীরা সমস্যা সম্পর্কে বলেন, "সাধারণত, এটি হলো যে কোনো দ্বন্দ্ব অথবা একটি পরিবেশ এবং অন্য পরিবেশ যা আমরা তৈরির জন্য আশা করছি-যেমন আমাদের গন্তব্য। (In general, it is any conflict or difference between one situation and another situation we wish to produce-our goal. উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 234.)

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

সমস্যা

যে কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম পদক্ষেপ হলো সমস্যা শনাক্ত করা। যে বিষয় নিয়ে গবেষক অনুধ্যান করতে চান, সে সম্পর্কে তাকে সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করতে হয়। এ কাজটি করতে হলে, ক্রাইডার ও তাঁর সহযোগিগণ (১৯৯৩)-এর মতে, গবেষককে তিনটি কাজ করতে হবে-

(১) তারা যে বিষয় সম্পর্কে জানতে চান সে বিষয়ে তাদের সতর্কতার সাথে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এবং তারপর সমস্যার বিশেষ দিকে তাদের দৃষ্টি দিতে হবে। যেমন, একজন গবেষক স্মৃতি সম্পর্কিত বিষয় থেকে একজন পরীক্ষক কত সময় একটি শব্দ তালিকা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতে পারে তার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন।

(২) উপযুক্ত চল শনাক্তের জন্য গবেষককে অবশ্যই সমস্যা বিশ্লেষণ করতে হবে।

(৩) গবেষককে অবশ্যই এ সকল চলের কার্যকরী সংজ্ঞা (Operational definition) প্রদান করতে হবে।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

সমস্যা

ম্যাক্তইগান (১৯৯০) সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সূত্রপাত হয় তখনই যখন কোনো বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভের পর আমরা উপলব্ধি করি যে, ঐ বিষয়ে অনেক কিছু এখনও আমরা জানি না। হতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই, অথবা এমনও হতে পারে যে, প্রাপ্ত তথ্য এমন এক বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে যে, এটিকে প্রশ্নের সঙ্গে যথোপযুক্তভাবে সংযুক্ত করা যাচ্ছে না। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের একটি সমস্যা রয়েছে।"।

বাসকিস্ট এবং জারবিং (১৯৯০) এর মতে, "একটি সমস্যা হলো একটি অবস্থা যেখানে একটি লক্ষ্য থাকে যা তাৎক্ষণিকভাবে অর্জন করা যায় না। যে সমস্যা নিয়ে আমরা আগ্রহান্বিত তা হলো সেগুলো যার জন্য প্রয়োজন একটি লক্ষ্যে পৌঁছবার নিমিত্তে একটি সমাধান অর্জনের জন্য চিন্তা করা।"

(A problem is a situation in which there is a goal that is not immediately obtainable. The problem that we are interested in are those that require thinking to derive a solution for obtaining the goal. উৎস: Psychology; Scott. Foresman/Little Brown Higher Education; 1990; P. 308)

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

সমস্যা

সমস্যার উৎস : সাধারণত জার্নাল, আনুষঙ্গিক বই ও পূর্বে সম্পন্নকৃত গবেষণা প্রতিবেদনকে সমস্যার ভালো উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। গবেষণা সমস্যার মূল কথা হলো কোনো বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। ম্যাক্সইগান (১৯৯০) এর মতে, পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব কমপক্ষে তিনভাবে (কিছুটা মিশ্রভাবে) লক্ষ করা যায়:

(১) যখন গবেষণার ফলাফলে লক্ষণীয় ফাঁক বা ঘাটতি থাকে;

(২) যখন বিভিন্ন অনুসন্ধানের ফলাফলে ঐকমত্য না থাকে; এবং

(৩) যখন কোনো ঘটনা (fact) অব্যাখ্যাত (unexplained) তথ্য হিসেবে বিরাজ করে।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

সমস্যা

সাধারণত তিন ধরনের অবস্থা থেকে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যথা-

১. জ্ঞানের অভাব বা শূন্যতা: জ্ঞানের অভাব বা শূন্যতা থেকে সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। কোনো ঘটনা সম্পর্কে হয়তো বহু তথ্যই উৎঘাটিত হয়েছে। কিন্তু একটি বিশেষ তথ্য সম্পর্কে এখনও আমাদের জ্ঞানের শূন্যতা রয়েছে। এ জ্ঞানের শূন্যতা আমাদের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়; আর এ প্রশ্নকেই সমস্যার রূপ দিয়ে তা সমাধানের জন্য পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করা হয়।

যেমন, আমরা দেখতে চাই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সফল পদ্ধতি কোন্টি-বক্তৃতা দান পদ্ধতি (Lecture method) না আলোচনা পদ্ধতি (Discussion method)? অথবা স্মৃতি সংরক্ষণে কোনো পদ্ধতি বেশি ফলপ্রসূ-প্রত্যাহবান (recall) পদ্ধতি না প্রত্যাভিজ্ঞা (recognition) পদ্ধতি? এ ধরনের হাজারো সমস্যা নিয়ে গবেষক গবেষণা করে থাকেন। এর সঠিক উত্তর না জানা পর্যন্ত এ সব ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হচ্ছে জ্ঞানের শূন্যতা। এ সমস্যার সমাধানের জন্যই গবেষণার দরকার হয়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

সমস্যা

২. পরস্পর বিরোধী ফলাফল: অনেক সময় একই বিষয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল বা পরস্পর বিরোধী ফলাফল প্রকাশ করেন। তখন কোন্ বিজ্ঞানীর পরীক্ষণের ফলাফল যথার্থ? এ প্রশ্নটি দেখা দেয়। ফলে জন্ম নেয় নতুন সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় নতুন করে পরীক্ষণ পরিচালনার। :

উদাহরণস্বরূপ, একজন পরীক্ষণকারী তার পরীক্ষণে দেখতে পেলেন যে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বক্তৃতাদান পদ্ধতির চেয়ে আলোচনা পদ্ধতি বেশি ফলপ্রসূ। আবার অন্য একজন পরীক্ষণকারী এর উল্টো ফল পেলেন। এ ধরনের সমস্যা থেকে রেহাই পাবার জন্য আবার নতুন করে একাধিক পরীক্ষণ পরিচালনা করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফলসমূহের পারস্পরিক মিল পূর্বের পরস্পর বিরোধী ফলাফল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান প্রদান করে।

৩. তথ্যের ব্যাখ্যা: কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য আবার পরীক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ সংগ্রহকৃত যে তথ্য সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, সে সম্পর্কে জানার জন্য পরীক্ষণের প্রয়োজন।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

সমস্যা

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ছাত্র পরীক্ষার হলে গেলে জানা বিষয় ভুলে যায়, কিন্তু আবার বাড়ি ফিরে এলে তা না দেখে বলতে পারে। পড়ার টেবিলে বসে মুখস্থ করা বিষয় বলতে পারা এবং পরীক্ষার হলে গিয়ে তা ভুলে যাওয়া- এ তথ্যের ব্যাখ্যা করতে গেলে নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হবে এবং তা পরীক্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

পরীক্ষণমূলক সমস্যার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে যথা:

(১) পরীক্ষণের জন্য যে সমস্যাটি নির্ধারণ করা হয় তা সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট হতে হবে। অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক সমস্যা নিয়ে পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করা যায় না।

(২) সমস্যাকে অবশ্যই পরীক্ষণযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ সমস্যাকে এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন সেটি পরীক্ষণ করা যায়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

বিজ্ঞানের একটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা হলো যে, বিজ্ঞান সুশৃঙ্খল জ্ঞানের সমষ্টি। যে কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান শুরু হয় একটি সমাধানযোগ্য সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। সমস্যা স্থিরকরণের পর তার সমাধানের জন্য পরীক্ষণকারী পরীক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরীক্ষণটির রূপরেখা কী হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রথমে সমস্যার একটি সম্ভাব্য সমাধান কল্পনা করে নিতে হয়। এ কল্পিত সমাধানকে প্রকল্প বা অনুমান (Hypothesis) বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে প্রশ্নটি পরীক্ষণকারীকে পরীক্ষণে আগ্রহী করে তোলে তার একটি সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে প্রকল্প।

সেল্টি ও তাঁর সহযোগীরা (১৯৬৯) কোহেন ও ন্যাগেল-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, 'কোনো একটি অনুসন্ধান কার্যে আমরা যে সমস্যাটির সমাধান খোঁজ করছি, সে সমস্যাটির একটি সম্ভাব্য সমাধান বা ব্যাখ্যা ছাড়া এক পা-ও অগ্রসর হতে পারি না। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে অথবা বিষয়বস্তুর জ্ঞান থেকে এ সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আমাদের মনে উদিত হয়। এ ধরনের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে যখন প্রস্তাবনার আকারে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বলে প্রকল্প'।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

ক্রাইডার, গোথালস, কেভানহ্ এবং সলোমন বলেন, "একটি প্রকল্প হলো চলসমূহের মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব যা কখনো পর্যবেক্ষণের উপর, কখনো তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।"
(A hypothesis is a proposition, sometimes based on observation, sometimes on theory, about cause and effect relationships between variables. উৎস: Psychology; Scott, Foresman and Company; 1983; P. 14.)

ম্যাক্তইগান (F. J. McGuigan) প্রকল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "আমরা একটি প্রকল্পকে চলসমূহের মধ্যকার একটি প্রচ্ছন্ন সম্পর্কের একটি প্রমাণিতব্য উক্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি।"
(We may define a hypothesis as a testable statement of a potential relationship between variables. উৎস : Experimental Psychology; Prentice-Hall of India Private Limited; 1990; P.35.)

ওয়াইনী ওয়াইটেন (Wayne Weiten) এর মতে, "দু বা ততোধিক চলের মধ্যকার সম্বন্ধ সম্পর্কিত আনুমানিক উক্তিই হলো প্রকল্প"। (A hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variables. উৎস: Psychology; Brooks/Cole Publishing Company; 1989; P. 36)

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

যে কোনো ধরনের একটি প্রকল্প সমস্যাটির সঠিক সমাধান দিতে পারে না। তবে একটি ভালো প্রকল্প এমন হতে হবে যে, এখানে দুটো বা ততোধিক চলের মধ্যে একটি সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং এ ধরনের সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়।

প্রকল্পের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকল্পটি বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। প্রকল্পটি এমন সব চলের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করবে যেগুলো বাস্তব জগতের ঘটনাবলির পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ থেকে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রকল্পে যে সব চলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হচ্ছে, সে সব চলের কার্যকরী সংজ্ঞা দিতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা চলটিকে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করতে পারি।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

প্রকল্প প্রণয়ন

Framing of Hypothesis.

কোনো পরীক্ষণে প্রকল্প প্রণয়ন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ প্রকল্প প্রণয়নের উপর পরীক্ষণের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রকল্প করার ভিত্তি কী বা কীভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়? নানাভাবে প্রকল্প নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো প্রকল্পের একটি উৎস। কোনো বিষয় সম্পর্কে পূর্ব-অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান থাকলে সে বিষয়ে মনে নানা ধরনের প্রশ্নের উদয় হতে পারে এবং সে সকল প্রশ্নের উত্তর কী হবে সে সম্পর্কেও ধারণা আসতে পারে। তাই বলা যায় যে, কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানই হলো প্রকল্পের ভিত্তি।

আবার, কেউ কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা করতে গিয়ে সে বিষয়ে হয়তো নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। নতুন তথ্য আবিষ্কারের সাথে সাথে তার মনে কিছু নতুন প্রশ্নও জাগতে পারে এবং এ সকল প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর কী হতে পারে সে ব্যাপারেও একটি ধারণা জন্মে। এভাবেও প্রকল্প তৈরি হতে পারে। শুধু পরীক্ষাগার থেকেই নয়, আকস্মিক পর্যবেক্ষণ থেকেও আমাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে। কোনো বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সে বিষয়ে অনেক কার্যকারণের সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারায় একটা প্রকল্প দানা বেঁধে ওঠে।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

পরীক্ষণে প্রকল্প প্রণয়ন বা বর্ণনা করার কিছু সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি আছে। প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে Bartrand Russel-এর বক্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রকল্প "যদি ..., তাহলে ...।" (If .... then ...) এই আকারে প্রকাশ করতে হবে। অর্থাৎ কোনো একটি কারণ ঘটলে তারপর অন্য কোনো কারণ ঘটবে। "যদি ..., তাহলে ..." সম্পর্কটি আরো একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। প্রথম কারণটি 'ক' এবং দ্বিতীয় কারণটি 'খ' ধরা যাক। এখন বলা যায়-"যদি ক, তাহলে খ" অর্থাৎ "যদি ক হয়, তাহলে খ হবে।" যদি ক সত্যি হয়, তাহলে খ-ও সত্য হবে। এখানে ক ও খ-এর সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এখানে 'ক' হলো পূর্বগামী শর্ত এবং 'খ' হলো অনুগামী শর্ত। অর্থাৎ একটি প্রকল্পে একটি পূর্বগামী ও একটি অনুগামী শর্তের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়। যেমন, যদি বৃষ্টি হয় (ক), তাহলে রাস্তা ভিজা থাকবে (খ)। অথবা, যদি শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় (ক), তা হলে উৎপাদন হ্রাস পাবে (খ)।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনোবিজ্ঞানিগণ সব সময়ই বার্ট্রান্ড রাসেলের উপদেশ মেনে চলেন না। অর্থাৎ তাঁরা যেভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করেন তাতে সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। যেমন, "কর্মরত মহিলারা বেকার গৃহিণীদের চেয়ে দাম্পত্য জীবনে অধিকতর সুখী"-প্রকল্পটি নিয়ে নীহার রঞ্জন সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা করেছেন। অথবা "আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন স্ত্রীলোকেরা পরিবার পরিকল্পনার প্রতি বেশি আগ্রহী"-প্রকল্পটি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক- ড. আহম্মদ উল্লাহ মিয়া, নীহার রঞ্জন সরকার এবং মোঃ শমশের আলী গবেষণা করেছেন।

উপরোক্ত দুটি প্রকল্পের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কোনোটিতেই দুটি চলের মধ্যকার সম্পর্ক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এতে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই চল দুটির মধ্যকার সম্পর্ক উহ্য রয়েছে। মূল কথা হচ্ছে, প্রকল্পে একটি সামান্য সম্পর্কের ইঙ্গিত থাকতে হবে এবং এটিকে প্রমাণসিদ্ধ বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

পরীক্ষণে প্রকল্পের গুরুত্ব

Importance of Hypothesis in Experiment

মনোবিজ্ঞানের গবেষণা বা অনুসন্ধানকার্যে পরীক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রকল্প হচ্ছে পরীক্ষণের হালস্বরূপ। হালবিহীন নৌকার কথা যেমন চিন্তা করা যায় না, তেমনি প্রকল্প ছাড়া পরীক্ষণের কথাও ভাবা যায় না।

প্রকল্পের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, কোনো সমস্যার প্রমাণ সাপেক্ষ সম্ভাব্য সমাধানই হচ্ছে প্রকল্প। কোনো সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে যখন পরীক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন পরীক্ষণটির রূপরেখা কী হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের উপর ভিত্তি করেই পরীক্ষণকার্য পরিচালিত হয়। সকল প্রকল্পই সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারে না। তবে একটি ভালো প্রকল্প এমন হতে হবে যে, এখানে দুই বা ততোধিক চলের মধ্যে একটি সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং এ সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়। প্রকল্পের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রকল্পটি বস্তুনিষ্ঠ (objective) হতে হবে। অর্থাৎ প্রকল্পটি এমন সব চলের সম্পর্ক নির্দেশ করবে, যেগুলো বাস্তব জগতের ঘটনাবলির পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ থেকে পাওয়া যাবে। আর একটু ভিন্নভাবে বলা যায় যে, প্রকল্পে যে সকল চলের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপন করা হচ্ছে সে সকল চলের কার্যকরী সংজ্ঞা দিতে হবে-যার মাধ্যমে আমরা চলটিকে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করতে পারি।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

প্রকল্প হচ্ছে পরীক্ষণের প্রাণকেন্দ্র। অর্থাৎ এ প্রকল্পকে কেন্দ্র করেই সমস্ত পরীক্ষণকার্য পরিচালিত হচ্ছে। পরীক্ষণে কোন্ কোন্ চলের প্রভাব পরিমাপ করতে হবে, আবার কোন্ কোন্ চল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, পরীক্ষণের নকশা কেমন হবে এবং সর্বোপরি কার্যপ্রণালি কেমন হবে-সবই নির্ভর করছে প্রকল্পটির উপর। অর্থাৎ প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে এসব প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

মানুষ ও প্রাণীর আচরণই হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আচরণকে ঘিরেই চলছে মনোবিজ্ঞানের গবেষণা বা অনুসন্ধানকার্য। আর এ গবেষণায় পরীক্ষণ পদ্ধতি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরীক্ষণ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পরীক্ষণের মূল এবং এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রকল্প। এ প্রকল্পকে ঘিরেই সমগ্র পরীক্ষণকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায়, পরীক্ষণকার্যে তথা মনোবিজ্ঞানিক গবেষণায় প্রকল্পের প্রযোজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই পূর্ব কথার জের টেনে বলা যায়, প্রকল্প ছাড়া পরীক্ষণ আর হালবিহীন নৌকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

প্রকল্পের প্রকারভেদ

Types of Hypothesis

এফ. জে. ম্যাক্তইগান (১৯৯০) দু'ধরনের প্রকল্পের উল্লেখ করেছেন। যথা-

১। সর্বজনীন প্রকল্প (Universal Hypothesis)

২। অস্তিত্ববাদী প্রকল্প (Existential Hypothesis)

(১) সর্বজনীন প্রকল্প: সর্বজনীন প্রকল্প হলো এমন প্রকল্প যা দুই বা ততোধিক চলের একটি সাধারণ বা সর্বজনীন সম্পর্ক প্রকাশ করে। অর্থাৎ সম্পর্কটি সব সময়ে এবং সকল স্থানে সকল চলের সব মূল্যমানের ক্ষেত্রে সত্য হবে। সর্বজনীন প্রকল্পের একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, "সকল কলেজ ছাত্রের ক্ষেত্রে, মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে সময় মতো অংশ গ্রহণের জন্য যদি তাদের পুরস্কৃত করা হয়, তাহলে তারা খুব তৎপর হবে"। আচরণের মধ্যে অনেক ব্যতিক্রম থাকার কারণে মনোবিজ্ঞানে সর্বজনীন প্রকল্পের পরিসর অনেকটা সীমাবদ্ধ।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

(২) অস্তিত্ববাদী প্রকল্প: অস্তিত্ববাদী প্রকল্প হলো সেই প্রকল্প যা বিশেষ ক্ষেত্রে সত্য হয়, বা কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সত্য হয় এমন সম্পর্ক প্রকাশ করে (অস্তিত্ববাদী বলতে একটির অস্তিত্বকে বোঝায়)। উদাহরণস্বরূপ, "কমপক্ষে একজন ছাত্র যদি সময় মতো মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য পুরস্কৃত হয়, তাহলে সে খুবই তৎপর হবে"। অস্তিত্ববাদী প্রকল্পের উদাহরণ প্রচুর। মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় অস্তিত্ববাদী প্রকল্পের ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে।

আবার বিমূর্তকরণের মাত্রা (Level of Abstraction) এর ওপর ভিত্তি করে গুড এবং হ্যাট্ (Goode and Hatt, ১৯৫২) প্রকল্পকে নিম্নরূপভাবে ভাগ করেছেন। চিত

১। সর্বনিম্ন পর্যায়ের প্রকল্প: সর্বনিম্ন পর্যায়ের প্রকল্পে বাস্তব জগতের পর্যবেক্ষণযোগ্য কোনো ঐক্য বা সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে ধারণা করা হয়। এ ধরনের প্রকল্পে সাধারণত কোনো প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে অনুমান করা হয়। যেমন, বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিশুই ৪-৬ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

২। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পর্যায়ের প্রকল্প: এ ধরনের প্রকল্পে বিভিন্ন সাধারণ ধারণা অথবা প্রাকৃতিক জগতের সামঞ্জস্যতার মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ এ সকল যৌক্তিক সম্পর্কের সত্যতা যাচাই করার জন্যই এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। ক্লার্ক হাল-এর অভ্যাসের শক্তি, প্যান্ডের সাপেক্ষীকরণ- এ ধারণাসমূহ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পর্যায়ের প্রকল্পের উদাহরণ।

৩। সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রকল্প: এ ধরনের প্রকল্পে বিভিন্ন চল বা যৌক্তিক ধারণার সাথে অন্যান্য চলের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রকল্পে দুটি চলের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সততা উন্নয়নের চাবিকাঠি, অথবা বৃষ্টি হলে রাস্তা ভিজা থাকবে।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

ভালো প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of a Good Hypothesis

প্রকল্প হলো দুই বা ততোধিক চলের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে একটি প্রমাণ সাপেক্ষ উক্তি। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কোনো অনুসন্ধান কার্যের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং সমস্যা সমাধানের যুক্তিসংগত ইঙ্গিত প্রদান। তাই যে কোনো পরীক্ষণ পরিচালনা করতে গেলে একটি ভালো প্রকল্প প্রণয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন। একটি ভালো প্রকল্পের যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১। প্রকল্প প্রমাণ সাপেক্ষ হবে: কোনো প্রকল্পের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকল্পকে প্রমাণ সাপেক্ষ হতে হবে। বাস্তব ঘটনা বা তথ্যের দ্বারা যদি প্রকল্পটি যাচাই করা না যায়, তাহলে তাকে ভালো প্রকল্প বলা যাবে না। বাস্তব তথ্য দ্বারা যদি কোনো প্রকল্পকে সত্যায়িত করা না যায় তাহলে এ ধরনের প্রকল্প বর্জন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'যে সকল লোক অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ তারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয় না'- এরূপ প্রকল্প প্রমাণ করা কঠিন। কারণ অতিরিক্ত কল্পনা প্রবণতা একটি অস্পষ্ট কথা যা পরিমাপ করা কঠিন। তাই এ ধরনের প্রকল্প অর্থহীন।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

২। প্রকল্প সুনির্দিষ্ট হবে: যে প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে তা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে। প্রকল্পে যে সব ধারণা ব্যবহার করা হবে তা সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং ধারণাগুলোর মধ্যকার সম্পর্কও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন, 'ছাত্রদের পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য সংযোজন করলে মেধার বিকাশ ঘটবে।'- এ প্রকল্পটিতে ছাত্র এবং বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য দুটো অস্পষ্ট ধারণা। কারণ ছাত্র বলতে কোন পর্যায়ের/শ্রেণির তা নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং কোন ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই এ ধরনের প্রকল্পকে ভালো প্রকল্প বলা যায় না। প্রকল্পটি ভালো হবে যদি তা এভাবে করা যায়-'দশম শ্রেণির ছাত্রদের পাঠ্যসূচিতে মানব দেহের গঠন ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য সংযোজন করলে মেধার বিকাশ ঘটবে'।

৩। প্রকল্প সত্য ঘটনাভিত্তিক হবে: বাস্তব এবং সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে; কল্পিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নয়। যেমন 'আকাশের তারাগুলো পৃথিবীতে নেমে এলে শান্তির বন্যা বয়ে যাবে'- প্রকল্পটি সত্য ঘটনা বা বাস্তব ঘটনাভিত্তিক নয়। এ ধরনের প্রকল্পকে ভালো প্রকল্প বলা যায় না।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

৪। প্রকল্প যৌক্তিক হবে: একটি ভালো প্রকল্প সবসময় যৌক্তিকভাবে সংগতিপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ হবে। উদাহরণস্বরূপ 'ভেজাল খাদ্য খাওয়ার ফলে মানুষের আকার ছোট হচ্ছে'- এ প্রকল্পে যে ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে তার মূলে কোনো যুক্তি নেই। এ ধরনের অযৌক্তিক প্রকল্পকে ভালো প্রকল্প বলা যাবে না।

৫। প্রকল্পে স্ববিরোধিতা থাকবে না: প্রকল্পে স্ববিরোধিতা থাকলে তাকে ভালো প্রকল্প বলা যাবে না। প্রকল্প হবে আত্মসংগতিপূর্ণ। যেমন, 'সুষম খাবার খেলে শরীর সুস্থ থাকে না'- এ ধরনের প্রকল্প আত্মসঙ্গতিপূর্ণ নয়- স্ববিরোধী। কারণ সুষম খাবার খেলে শরীর সুস্থ থাকে। কাজেই স্ববিরোধী প্রকল্প গ্রহণযোগ্য নয়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

৬। প্রকল্প পরিমাণগত ভাষায় প্রকাশযোগ্য হবে: প্রকল্পকে যদি সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় তাহলে তাকে একটি ভালো প্রকল্প বলা যায়। প্রকল্পে ব্যবহৃত চলসমূহকে যদি সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় তাহলে সেগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করা সহজ হয়। যেমন 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বেকারত্ব বেড়ে যায়'।

৭। প্রকল্পের তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকবে: প্রায়শ কোনো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রণয়ন করে তা সত্যায়িত করার চেষ্টা করা হয়। যেমন, 'পালক চিহ্নিত রেখা তীর চিহ্নিত রেখা অপেক্ষা বড় দেখাবে, যদিও রেখা দুটো সমান'- প্রকল্পটি মূলার-লায়ার অধ্যাস তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৮। প্রকল্পের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত হবে: ভালো প্রকল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকল্পটি এমন হবে যেন তা থেকে বহু সংখ্যক বা অতিরিক্ত প্রকল্প গঠন করা সম্ভব হয়। প্রকল্পের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত হলে তা থেকে বহু সংখ্যক প্রকল্প গঠন করা যায়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

প্রকল্প

৯। প্রকল্প সহজ সরল ধারণার মাধ্যমে ব্যক্ত হবে: প্রকল্পে যে সকল ধারণা ব্যবহার করা হয় তা সহজ সরল হতে হবে। জটিল ধারণা পরিত্যাগ করে সহজ ধারণার সাহায্যে প্রকল্প গঠন করলে তা ভালো প্রকল্প হিসেবে গণ্য হবে।

১০। প্রকল্প পরীক্ষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে: যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে, প্রকল্পটি অবশ্যই তার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। মূল বিষয়ের সাথে অসংগত প্রকল্পকে ভালো প্রকল্প বলা যাবে না।

১১। প্রকল্প পর্যবেক্ষণযোগ্য হতে হবে: প্রকল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রকল্প পর্যবেক্ষণযোগ্য হবে। পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়, বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।

১২। প্রকল্পের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য থাকবে: প্রকল্প এমন হবে যেন বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায়। যে প্রকল্প বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় তাকে ভালো প্রকল্প বলা যায় না।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

পরীক্ষণ পরিচালনা ও উপাত্ত সংগ্রহ

পরীক্ষণ পরিচালনা করতে গেলেই প্রথমে কোন নমুনার উপর পরীক্ষণ পরিচালনা হচ্ছে তা জানতে হবে। গবেষককে আগেই ঠিক করতে হবে পরীক্ষণপাত্র কারা হবে, কোন প্রক্রিয়ায় তাদের বাছাই করতে হবে, পরীক্ষণে দুই বা ততোধিক দল গঠন এবং প্রতিটি দলে কতজন পরীক্ষণপাত্র থাকবে ইত্যাদি। পরীক্ষণে নমুনার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সাধারণত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অনুমান করা হয়ে থাকে। এজন্য নমুনাকে অবশ্যই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে। কারণ, নমুনা প্রতিনিধিত্বমূলক না হলে নমুনার পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য সত্য নাও হতে পারে।

পরীক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে নকশা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নকশা হচ্ছে পরিকল্পনা। নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে একটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার পূর্বেই ঐ পরিস্থিতিতে কার্যকরী করার উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াই হলো নকশা। মূলত প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু ও যথার্থ পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণার লক্ষ্য অর্জন করার পরিকল্পনাই হচ্ছে গবেষণা নকশা।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

পরীক্ষণ পরিচালনা ও উপাত্ত সংগ্রহ

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন। পারীক্ষণপাত্রের সঠিক প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধকরণে যন্ত্রপাতি বা প্রশ্নমালার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো গবেষণায়ই ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা প্রশ্নমালার উপর আমাদের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল। এজন্য যন্ত্রপাতি বা প্রশ্নমালা নির্বাচনের প্রাক্কালে ঐ সব যন্ত্রপাতি বা প্রশ্নমালা যেন যথার্থ, নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক তথ্য প্রদানে সক্ষম হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

পরীক্ষণ পরিচালনা ও উপাত্ত সংগ্রহ

গবেষণার ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যথাযথ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উপরই নির্ভর করছে একটা গবেষণা কাজের সুসম্পূর্ণতা ও গুণগতমান। কাজেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, যে কোনো গবেষণার জন্য উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সুষ্ঠু, সহজ সরল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এর উপরই নির্ভর করে পরিসংখ্যানের ফলাফলের সঠিকতা ও নির্ভুলতা।

যে সকল উপাত্ত মূল উৎস থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় তাকে প্রাথমিক উপাত্ত বলে। এ ধরনের উপাত্ত মৌলিক উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত এবং পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের জন্য সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। যেসব তথ্য মূল উৎস থেকে সংগৃহীত হবার পর অন্য কোনো গবেষণার প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করা হয় তাকে মাধ্যমিক বা গৌণ উপাত্ত বলা হয়। মাধ্যমিক উপাত্ত পাওয়া যায় সাধারণত জার্নাল, সরকারি প্রকাশনা, প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকদের নিকট থেকে। মাধ্যমিক তথ্যের উপরই যথাযথ পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

উপাত্ত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পরিসংখ্যানিক গবেষণার কাজে সংগৃহীত তথ্যকে সম্পাদনার মাধ্যমে ভুলত্রুটি সংশোধন করে নির্ভরযোগ্য আকারে আনা হয়। তথ্যকে বিভিন্ন রকম পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি যেমন- লেখ, সারণি ইত্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে এবং সহজে পুরো তথ্যমালা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং তথ্য বিশ্লেষণ করতে সুবিধা হয়। অনুসন্ধান ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। এ বিক্ষিপ্ত তথ্যসমূহকে গুণ, সময়, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজানো হয়। শ্রেণিবদ্ধকরণে তথ্যসমূহকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য বিভিন্ন বয়স, পেশা, ধর্ম, লিঙ্গ ইত্যাদি অনুসারে শ্রেণিবদ্ধকরণ করা হয় এবং তথ্যসমূহকে এদের একের সাথে অন্যের সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণিতে সাজান হয়। শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু অধিকতর স্পষ্ট ও বিশ্লেষণ উপযোগী করার জন্য তথ্যসমূহকে সারিবদ্ধ করা হয়। যথাযথ ভিত্তি অনুসারে তথ্যসমূহ সাজিয়ে যদি তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাহলে তথ্যের বৈশিষ্ট্য এত সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে যাতে এক নজরে তথ্য ও গবেষণার বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। এতে গবেষণাকার্যে সময় ও পরিশ্রম কম লাগে।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

উপাত্ত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

অধিকাংশ গবেষণায়, বিশেষ করে কার্যকরী গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের সঠিক ব্যবহার করতে হলে তথ্যগুলোকে পরিমাণগতভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় এবং এটি কয়েকটি স্তরে সম্পন্ন করতে হয়, ফলে এসব বিশ্লেষণ জটিল হয়ে পড়ে। প্রথমেই গবেষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তথ্যের সারণি কি হাতে না যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত গবেষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তথ্যকে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট আকারে পরিবর্তিত করতে হবে যার ফলে তথ্যরাশিকে প্রক্রিয়াজাত করা সহজ হবে। তৃতীয়ত, গবেষককে অবশ্যই কতগুলো পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

উপাত্ত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সারণি প্রস্তুত করার কারণ হলো, অসংখ্য তথ্যকে এক নজরে দেখার সুবিধা এবং গাণিতিক বিশ্লেষণ করা। জরিপভিত্তিক গবেষণায় বিরাট সংখ্যক নমুনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যারাশি সারণিবদ্ধ না করা হলে কোনো রকম বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। এর পরের পদক্ষেপ হলো নমুনা তথ্য নির্ণয় করা। বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যান নির্ণয় করতে হয়। যেমন গড়, মধ্যমা, গড় বিচ্যুতি, আদর্শ বিচ্যুতি ইত্যাদি। কোনো জনসমষ্টি সম্পর্কে একটি ধারণা করতে গেলে এক বা একাধিক নমুনার ওপর ভিত্তি করেই তা করতে হয়। আবার দুটি চলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য আমরা সহপরিবর্তন, নির্ভরণাঙ্ক, কাইবর্গ ইত্যাদি নির্ণয় করতে পারি।

একটি নমুনা থেকে আমরা যেসব পরিমাণগত তথ্য পাই, সাধারণত আমরা সেগুলোর একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ের চেষ্টা করি। বহু সংখ্যক পরিমাণ গ্রহণ করা হলে পরিমাপগুলো সাধারণত মাপকের মধ্যবিন্দুর দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলো হলো- গড়, মধ্যক ও প্রচুরক। এগুলো থেকে বণ্টনের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়। কোনো

একটি বণ্টনের পরিমাপসমূহ একে অন্যের থেকে কতটুকু পৃথক তা জানার জন্য আমরা বিচ্যুতির পরিমাপ করে থাকি। বিচ্যুতির পরিমাপগুলো হলো- চতুর্থাংশীয় বিচ্যুতি, গড় বিচ্যুতি, আদর্শ বিচ্যুতি ইত্যাদি। বিচ্যুতির পরিমাপ দ্বারা পরিমাপসমূহের মধ্যকার সমরূপতা বা অসমরূপতা পরিমাপ করা যায়।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

ফলাফল উপস্থাপন

এ অনুচ্ছেদে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করতে হবে। পরীক্ষণপাত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে বিভিন্ন গাণিতিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রক্রিয়া, যেমন- গড়, মধ্যমা, আদর্শ বিচ্যুতি, ।-পরীক্ষণ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেক সময় সংগৃহীত উপাত্তসমূহকে বিভিন্ন তথ্য গাণিতিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার ছক বা চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়। তবে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য ছক বা চিত্রের সাহায্য নেওয়া হবে কিনা তা নির্ভর করে উপাত্তের বৈশিষ্ট্যের উপর।

পরীক্ষণের ধাপসমূহ

ফলাফল উপস্থাপন

ফলাফলের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক আলোচনা করা হয়। বর্তমান গবেষণার ফলাফলের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের তুলনা এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। ফলাফল কোনো প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে সমর্থন করে, অথবা অন্য কোনো মতবাদের জন্ম দেয় সে সম্পর্কে আলোচনা করে। আবার বাস্তব জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানে এ ফলাফল প্রয়োগ করা যায় কিনা সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। গবেষণায় অর্জিত ফলাফল কোনো প্রকল্পকে সমর্থন না করলে কী কী সম্ভাব্য কারণে প্রকল্পটি সমর্থিত হয়নি তাও আলোচনা করা হয়। গবেষণা পরিচালনায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে অথবা ফলাফলের ভিত্তিতে কোনো সুপারিশ করা সম্ভব হলে আলোচনায় তা উল্লেখ করতে হবে। তবে গবেষণার ফলাফল থেকে সমস্যাটির যে সব বিষয় জানা সম্ভব হয়নি এবং কোন কোন বিষয় নিয়ে আরো গবেষণা করা প্রয়োজন তা এক্ষেত্রে নির্দেশ করতে হবে।

গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণের পর যদি দেখা যায় যে, ফলাফল প্রকল্পের অনুকূলে তবে প্রকল্পটি সমর্থিত হয়েছে বলে ধরা হবে। আর যদি ফলাফল প্রকল্পের অনুকূলে না হয় তাহলে প্রকল্পটি সমর্থিত হয়নি বলে মনে করা হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মনোবিজ্ঞানে গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

টপিক – ০৬ পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

টপিক ০৬: পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

পরীক্ষণ একটি কার্যকরী গবেষণা পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো গবেষক চলসমূহের মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে নির্ভুলভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবেশগত চল নিয়ন্ত্রণ করে নির্ভরশীল চলের উপর অনির্ভরশীল চলের কী প্রভাব পড়ে তা লক্ষ করা হয়। এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনোও গবেষণা পদ্ধতিতে এ সুবিধা নেই। তাইতো মনোবিজ্ঞানিগণ যখনই সম্ভব পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা

১। বৈজ্ঞানিক নিয়ম: পরীক্ষণ পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি সবচেয়ে বেশি মেনে চলা হয়।

২। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: এ পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হলো এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হয় বলে প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনো চল পরীক্ষণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

৩। কৃত্রিম পরিবেশ: গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশ পরীক্ষকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। তাই পরীক্ষণকারী তার সুবিধামতো এবং পরীক্ষণের প্রয়োজন অনুসারে তার ইচ্ছানুযায়ী চলের পরিবর্তন করতে পারেন।

৪। পুনরাবৃত্তি: এর আর একটি সুবিধা হলো পুনরাবৃত্তি। এ পদ্ধতিতে কোনো বিষয়ের উপর বার বার পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করা যায়।

৫। ফলাফল: পরীক্ষণের নিয়মাবলি ও ফলাফল বস্তুনিষ্ঠভাবে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যায়। ইচ্ছুক বিজ্ঞানিগণ তা একই নিয়মে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যাচাই করে দেখতে পারেন।

৬। ফলাফল অধিক নির্ভরযোগ্য: এ পদ্ধতিতে ফলাফল ব্যক্তিদোষে দুষ্ট হতে পারে না। তাই ফলাফল হয় অধিক নির্ভরযোগ্য।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

৭। তথ্যের সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ: এ পদ্ধতিতে অনির্ভরশীল চলের পরিমাণগত পরিবর্তন এবং প্রাপ্ত তথ্যের সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ করা যায়।

৮। নির্ভুল তথ্য: পরীক্ষণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য নির্ভুল, যথার্থ ও সংক্ষিপ্ত হয়।

৯। যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা:

এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল-এর যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায়।

১০। চলের বিন্যাস:

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে নকশা অনুযায়ী চলের বিন্যাস ও ব্যবহার করা যায়।

১১। কারণ ও ফলাফল জানা: পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি বড় সুবিধা এই যে, নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনেক উপাদানের মধ্যে কোনটি কারণ এবং তার ফলাফল কী (Cause and effect relationship)- সে সম্পর্কে জানা যায়।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

পরীক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা

পরীক্ষণ পদ্ধতি সর্বোত্তম পদ্ধতি হলেও এর কতগুলো অসুবিধা রয়েছে। যেমন-

১। ঘটনার পুনরাবৃত্তি: যে সকল ঘটনা গবেষণাগারে পরীক্ষা করা যায় না অথবা যে সব ঘটনা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষণকারীকে অনিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করতে হয় সে সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি অচল। যেমন-দাঙ্গাকারী জনতার আচরণ, মিছিলকারীর আচরণ ইত্যাদি।

২। সামাজিক আচরণ: সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে সব আচরণের সৃষ্টি হয় (যেমন- জনমত, মনোভাব, বিশ্বাস ইত্যাদি) সে সব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার খুবই অসুবিধাজনক।

৩। সহযোগিতা না করা: এ পদ্ধতির আর একটা অসুবিধা হলো, পরীক্ষণপাত্র সব সময় পরীক্ষণকারীকে সহযোগিতা নাও করতে পারে।

৪। কৃত্রিম পরিবেশ: পরীক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো কৃত্রিম পরিবেশ। কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে এই পদ্ধতিতে পরীক্ষণ চালানো হয়। গবেষণাগারের নতুন এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এসে জীবের আচরণ স্বাভাবিক না হয়ে কৃত্রিম হতে পারে।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে, পরীক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই বেশি। বরং সঠিক পরিকল্পনা ও সতর্কতা অবলম্বন করলে এ সব অসুবিধা বহুলাংশে দূর করা সম্ভব হয়। তাছাড়া পরীক্ষণ পদ্ধতির অবদানই মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দান করেছে এবং মানব কল্যাণে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ কল্পনাতীত পরিমাণে বৃদ্ধি করে চলেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সংখ্যাতত্ত্বের উন্নতি সাধন ও ব্যাপক প্রচলন এবং সর্বোপরি গবেষণার নতুন নতুন উপকরণ আবিষ্কারের ফলে পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – মনোবিজ্ঞানে গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।"বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো একটি সমস্যা শনাক্তকরণ, উপাত্ত সংগ্রহকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাইকরণের একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।"-সংজ্ঞাটি কার?

ক. ক্রাইডার এবং সাথীরা　　খ. বি. এফ. এন্ডারসন

গ. ওয়াইনী ওয়াইটেন　　ঘ. পোস্টম্যান এবং ইগান

২।"চল শব্দটি দ্বারা কতগুলো বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, যাকে পরিমাপ বা পরিচালনা করা যায়।" সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?

ক. এন্ডারসন　　খ. জন সি. রাচ　　গ. রডিজার ও অন্যান্য　　ঘ. মর্গান ও সাথীরা

৩।"পরীক্ষণ কাঠামোর পরিমাপই হলো অনির্ভরশীল চল।"-সংজ্ঞাটি কার?

ক. এন্ডারসন　　খ. জন সি. রাচ　　গ. রডিজার এবং অন্যান্য　　ঘ. মর্গান ও সাথীরা

৪।"কোনো পরীক্ষণে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর আচরণই হলো নির্ভরশীল চল।" সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?

ক. এন্ডারসন　　খ. জন সি. রাচ　　গ. রডিজার ও অন্যান্য　　ঘ. মর্গান ও সাথীরা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫।কোন পদ্ধতিতে জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হয়?

ক. স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ খ. ঘটনা অনুধ্যান গ. পরীক্ষণ ঘ. পরিসংখ্যান

৬।"দু' বা ততোধিক চলের মধ্যকার সম্বন্ধ সম্পর্কিত আনুমানিক উক্তিই হলো প্রকল্প।" সংজ্ঞাটি কার?

ক. ওয়াইনী ওয়াইটেন খ. এন্ডারসন গ. জন সি. রাচ ঘ. ম্যাকগুইগান

৭।কোন পদ্ধতিতে স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে আচরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়?

ক. অন্তঃদর্শন খ. পরীক্ষণ গ. পর্যবেক্ষণ ঘ. চিকিৎসা

৮।কোন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আচরণ সংগ্রহ করা হয়?

ক. পরীক্ষণ খ. অন্তঃদর্শন গ. চিকিৎসা ঘ. পর্যবেক্ষণ

৯। মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?

ক. পরীক্ষণ খ. অন্তঃদর্শন গ. পর্যবেক্ষণ ঘ. চিকিৎসা

১০।কোনো সমস্যার কল্পিত সমাধানের নাম কী?

ক. চল খ. সমস্যা গ. প্রকল্প ঘ. দৈবায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১।কোনটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি?

ক. পরীক্ষণ পদ্ধতি খ. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি গ. চিকিৎসামূলক পদ্ধতি ঘ. অন্তর্দর্শন পদ্ধতি

১২।পরীক্ষণকারী পরীক্ষণের প্রয়োজনে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কোন চলের হ্রাস বা বৃদ্ধি করে থাকেন?

ক. অনির্ভরশীল চল খ. নির্ভরশীল চল গ. মধ্যবর্তী চল ঘ. বাহ্যিক চল

১৩। কোন চলকে তার উপস্থিতি বা সৃষ্টির জন্য অন্য কারও উপর নির্ভর করতে হয়?

ক. অনির্ভরশলী চল 'খ. নির্ভরশীল চল গ. মধ্যবর্তী চল ঘ. বাহ্যিক চল

১৪। গবেষক প্রাণীর আচরণের উপর যে চলের প্রভাব লক্ষ্য করেন তার নাম কী?

ক. অনির্ভরশীল চল খ. নির্ভরশীল চল গ. মধ্যবর্তী চল ঘ. বাহ্যিক চল

১৫। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় জীবের প্রতিক্রিয়াকে কোন চল বলে?

ক. অনির্ভরশলী চল খ. নির্ভরশীল চল গ. মধ্যবর্তী চল ঘ. বাহ্যিক চল

THANK YOU